বাংলা গীতিকার আধুনিক রূপান্তর : নাটক ও যাত্রার সীমায়

(BANGLA GEETIKAR ADHUNIK RUPANTAR : NATAK O YATRAR SEEMAY)

গবেষক

হিমাদ্রি মণ্ডল

Registration No.: R-17RS02120122 & Date : 13th February, 2019

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ঋতম্ মুখার্জি

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৬/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ভারতবর্ষ

২০২২

সূ চি প ত্র

প্রস্তাবনা		৩-৪
প্রথম অধ্যায়	**প্রসঙ্গ : বাংলা গীতিকা**	৫-৯
	ক. গীতিকার চরিত্র লক্ষণ ও বাংলা গীতিকার বিশিষ্টতা	৫-৬
	খ. বাংলা গীতিকার আবিষ্কার ও প্রকাশ	৬-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নাটকে গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ**	১০-১৭
তৃতীয় অধ্যায়	**যাত্রায় গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ**	১৮-২৬
চতুর্থ অধ্যায়	**অন্যান্য মাধ্যমে গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ**	২৭-২৮
পঞ্চম অধ্যায়	**বিভিন্ন মাধ্যমে গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**	২৯-৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	**গীতিকাররূপান্তরের সম্ভাব্য কারণ**	৩৩-৩৬
সপ্তম অধ্যায়	**গীতিকার রূপান্তরের মূলগত ভিত্তি ও রাজনীতি**	৩৭
অষ্টম অধ্যায়	**গীতিকার রূপান্তর : সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা**	৩৮-৩৯
উপসংহার		৪০
গ্রন্থপঞ্জি		৪১-৫২

প্রস্তাবনা

বাংলা গীতিকা নিয়ে বাংলা ভাষায় এদেশে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণার তথ্য বর্তমান গবেষকের নজরে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বহ্নিকুমারী চক্রবর্তীর *বাংলা গাথা কাব্য* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০)। এখানে মূলত বাংলা গাথা কাব্যের উদ্ভব, তার বিকাশ এবং বিভিন্ন শ্রেণির গাথা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের *পাশ্চাত্য গীতিকা ও বাংলা ব্যালাড* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭)-এ ফোকলোর শব্দের উদ্ভব, বাংলা গীতিকার বিভিন্ন শ্রেণি ও পাশ্চাত্য ব্যালাডের সঙ্গে বাংলা গীতিকার তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। অজন্তা বিশ্বাসের *বাংলা গীতিকার রূপতাত্ত্বিক ও গঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)-এ বাংলা গীতিকার মোটিফচয়ন, মটিফেমি নির্ণয়ের পর মটিফেমিক ডেপথ অনুসারে বাংলা গীতিকার শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। উত্তমকুমার মণ্ডলের *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা : লোক ঐতিহ্যের দর্পণে* ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার* ৪৮টি পালায় উঠে আসা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে দেখানোর পাশাপাশি পালার অভ্যন্তরে যে সমস্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান রয়েছে, সেগুলি লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারায় কীভাবে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালের ধারাপথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা গীতিকার তিনটি শ্রেণি- 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও 'নাথ গীতিকা'। অবশ্য অনেকে মৈমনসিংহ গীতিকাকে পূর্ববঙ্গ গীতিকারই অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে চান। বাংলা গীতিকা নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ডুসান জাবেভিটেল আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুখময় মুখোপাধ্যায়, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পল্লব সেনগুপ্ত, মানস মজুমদার, সৈয়দ আজিজুল হক- এমন বহু বিদগ্ধ মানুষের সম্পাদনা গ্রন্থ বা লেখালিখি রয়েছে। সেগুলি মূলত পাঠ ভিত্তিক আলোচনা। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* ১০টি পালা *মৈমনসিংহ গীতিকা* নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পালাগুলি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলা লোকসাহিত্যের এই শাখাটি নিয়ে দেশ-বিদেশে চর্চার পাশাপাশি নাটক, যাত্রা, চলচ্চিত্র, গীতিনাট্য, সংগীত, ছোটগল্প, কবিতা- ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে আধুনিক রূপান্তর শুরু হয়। মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সংখ্যায় অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হলেও অন্য দু-ধরনের গীতিকাও কমবেশি রূপান্তরিত হয়েছে।

এই গবেষণায় বাংলা গীতিকার কাহিনি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে আধুনিক নাট্যরূপ ও যাত্রারূপ পেয়েছে বিভিন্ন শিল্পীর হাতে সেই বিষয় নিয়ে বর্তমান গবেষণায় যেমন অনুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি একটি অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমে গীতিকার আধুনিক রূপান্তরের বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে গীতিকার কাহিনির যে আধুনিক রূপান্তর ঘটেছে সেবিষয়েও একটি অধ্যায় রয়েছে। ফলে 'বাংলা গীতিকার আধুনিক রূপান্তর : নাটক ও যাত্রায় সীমায়' গীতিকার আধুনিক রূপান্তর নিয়ে প্রথম গবেষণার প্রচেষ্টা বলা যায়। বাংলা গীতিকা পরবর্তীকালে নাটক ও যাত্রায় কীভাবে আধুনিক রূপান্তরিত হয়েছে তা পাঠ আধেয় ও আন্তর্বিদ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ও সাক্ষাৎকারেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কেবল রূপান্তর বিষয়ে তথ্য নয়, তার কারণ অনুসন্ধান, পাশাপাশি রূপান্তরের মূলগত ভিত্তি, রূপান্তরের ভিতরকার রাজনীতি- এ সমস্ত দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে আশ্রয় করে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে চিত্রও সংযোজিত হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের বর্ণসংস্থাপনের ক্ষেত্রে অভ্র সফটওয়্যারের কালপুরুষ ফন্টের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিধিকে অনুসরণ করা হয়েছে। উৎস নির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের নির্দেশিকাকে অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গ : বাংলা গীতিকা

লোকসাহিত্যের একটি শ্রেণি গীতিকা। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ballad'। প্রাচীন লাতিন 'ballare' থেকে 'ballad' শব্দের উদ্ভব। যার অর্থ 'নৃত্য'। পাশ্চাত্যে নৃত্যগীতের মধ্যদিয়ে যে সমস্ত কাহিনি পরিবেশন করা হতো তাকে বলা হতো 'ballad'। ইংরেজি 'ballad'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'গীতিকা' শব্দ ব্যবহৃত হলেও 'গীতিকা' এবং 'ballad'-এর স্বভাব, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য মেনে মৌখিক পরম্পরায় বাহিত হয়ে গীতিকা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে এসে পৌঁছেছে। পরবর্তীকালে এগুলি সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত রূপ পেয়েছে বিদ্যায়তনিক মানুষদের দ্বারা।

লোকসাহিত্য গবেষক বরুণকুমার চক্রবর্তী গীতিকার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেখানে বাংলা গীতিকার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, নিচে সেটি উল্লেখ করা হল:

> জটিলতামুক্ত মূলত: একটি ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যান, সচরাচার যা জনপ্রিয়, নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার নীতি-উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে, সারল্যকে রক্ষা করে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবকে রচিত যে সংগীত, তাই হল গীতিকা।[১]

ক. গীতিকার চরিত্রলক্ষণ ও বাংলা গীতিকার বিশিষ্টতা

আমরা যেগুলিকে গীতিকা বলছি বাংলায় সেগুলিকে- 'পালা', 'পালাগান', 'গাথা', 'কিসসা' 'কথা', 'কবিতা', 'শাস্তর', 'হাঁহলা' ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করতে দেখা যায়। কোনোটি অঞ্চলিক নাম, কোনোটি বা গীতিকা গবেষক কিংবা সম্পাদক প্রদত্ত। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা* গ্রন্থে এগুলিকে 'গীতিকা' বলে অভিহিত করেছিলেন। 'ballad' শব্দের সাদৃশ্যে, অনুপ্রেরণায় তিনি বাংলায় এই শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য রচনাগুলির জন্মের প্রক্রিয়া যদি আমারা লক্ষ করি তাহলে দেখব রচনাগুলিকে 'পালা', 'পালাগান', 'গাথা' বললেও ভুল হয় না। 'কথা', 'কবিতা',

'শাস্তর', 'হাঁহলা' এই চারটি নামের প্রথম তিনটি বাংলা গীতিকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হলেও সবকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিতে অক্ষম।

আমাদের দেশের গীতিকা বলুন কিংবা পালাগান এগুলি যারা পরিবেশন করতেন তারা মূল চেহারাটা অবিকৃত রেখে কিছু কিছু পরিবর্তন করতেন। মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি প্রায়শই ঘটে থাকে। ফলে বাংলা গীতিকাগুলির যে মুদ্রিত রূপ আজ আমরা দেখছি সেগুলি বিভিন্ন জনের দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া একটি রূপ এমন অনুমান করা দোষের নয়। তবে উল্লেখ্য সেসমস্ত লোকশিল্পীদের পরিবর্তন খুব সচেতন ছিল না। মূল কাহিনি ঠিক রেখে তাঁরা সংযোজন বা বিয়োজন করতেন আসর ও অবস্থা অনুযায়ী। কিন্তু বাংলা গীতিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মাধ্যমে আধুনিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে, সংগ্রাহক, সম্পাদক কিংবা পরবর্তী শিল্পীরা যে পরিবর্তন করেছেন, যে ধরনের রূপান্তর ঘটিয়েছেন সেগুলি সচেতন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ফলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রথম পরিবর্তনের চরিত্রগত, মাত্রাগত তফাত অনেকখানি। বর্তমান গবেষণায় দ্বিতীয় পরিবর্তনের দিকটির আলোচনা করাই লক্ষ্য, তবে গীতিকার পাঠান্তর নিয়ে খুব বেশি আলোচনা থাকবে না। নাটক-যাত্রা কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে গীতিকার আধুনিক রূপান্তর নিয়েই মূলত আলোচনা করা হবে।

খ. বাংলা গীতিকার আবিষ্কার ও প্রকাশ

বাংলা গীতিকার তিন শ্রেণির মধ্যে নাথ গীতিকা প্রাচীনতম। নাথ গীতিকা নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য রচিত। নাথ-গীতিকার দুটি ভাগ- একটি গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনি, অন্যটি গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনি। নাথ-গীতিকার রচয়িতা হিসেবে যাঁদের নাম জানা যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- ভবানী দাস, সুকুর মামুদ, শেখ ফয়জুল্লা (কবীন্দ্র দাস), দুর্লভ মল্লিক প্রমুখ। পুঁথিগুলির কাহিনির অনেকাংশের মধ্যেকার সাদৃশ্য সন্দেহ জাগায় কাহিনিগুলি কতখানি স্বকল্পিত।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (প্রথম ভাগ ৩ নং) জি. এ. গ্রীয়ারসন সাহেবের সম্পাদনায় *The Song of Manik Chandra* নামে গানের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। গানগুলি তিনি রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় দুর্লভ মল্লিক বিরচিত *গোবিন্দচন্দ্র গীত* প্রকাশিত হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একমাত্র নাথ গীতিকার পুঁথি। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রংপুর থেকে *গোপীচাঁদের মাতা* নামক একটি পাঠ সংগ্রহ করেন। এটি *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* ১৫শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *যোগীর পুঁথির* রচয়িতা আবদুল সুকুর মহম্মদ ছিলেন রাজশাহী জেলার রামপুর বেয়ালিয়ার পূর্বাবস্থিত সিন্দূরকুসুমী গ্রাম নিবাসী। এই কাব্যটি

১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ভবানী দাস নামক এক কবি ময়নামতীর গান অবলম্বনে *গোপীচন্দ্রের পাঁচালী* রচনা করেছিলেন আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। নলিনীকান্ত ভট্টশীল ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এই কাব্যটি ১৩২১ সনে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ' থেকে প্রকাশিত হয়। নলিকান্ত ভট্টশীলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে ১৩৩২ সনে আব্দুল সুকুর মহম্মদ রচিত *গোপীচাঁদের সন্ন্যাস* কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে *গোপীচন্দ্রের গান*-এর ১ম খণ্ডটি প্রকাশ পায়। এই খণ্ডে ছিল কেবল 'গোপীচন্দ্রের গান' অংশটি। ২য় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। এই খণ্ডে ছিল 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' অংশদ্বয়। দুই খণ্ডে সংকলিত তিনটি পাঠের মধ্যে আছে মৌখিক সংগ্রহ 'গোপীচন্দ্রের গান', দ্বিতীয় পাঠটি ভবানীদাস রচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' এবং তৃতীয় পাঠটি সুকুর মামুদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে দুটি খণ্ডে গোপীচন্দ্রের কাহিনির যে তিনটি পাঠ প্রকাশিত হয়, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে তা পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে।

১৩২০ সনের বৈশাখ সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯১৩) *সৌরভ* পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে-র প্রাচীন মহিলাকবি চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে 'মালীর জোগান' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি মৈমনসিংহ জেলার নানা লোককাহিনি, কবিগান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে 'দস্যু কেনারামের পালা', 'চন্দ্রাবতী', কবিকঙ্কনের 'বিদ্যাসুন্দর' পালার কিছু পঙক্তি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বিশেষ উৎসাহিত হন। তিনি যোগাযোগ করেন *সৌরভ* পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের সঙ্গে। কেদারনাথ মজুমদারের মধ্যস্থতায় চন্দ্রকুমার দের সঙ্গে পরিচয় হয় দীনেশচন্দ্র সেনের। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে ওই অঞ্চলের লোকগাথা, ব্রতকথা, রূপকথা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। চন্দ্রকুমার দে ছাড়াও বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কবি জসীম উদদীন প্রমুখ সংগ্রাহকরা আরও কিছু পালা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে।

চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত মোট ২৫ টি পালার প্রথম দশটি পালা *Eastern Bengal Ballads-Mymensingha* (vol-I, part-I) নামে ভাবানুবাদ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ২৩

শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩। বাংলায় মূল পালাগুলি প্রকাশিত হয় *মৈমনসিংহ-গীতিকা* [পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা] নামে ২৪ শে নভেম্বর ১৯২৩। *মৈমনসিংহ-গীতিকা* গ্রন্থে জায়গা না পাওয়া চন্দ্রকুমার দের সংগৃহীত পালার থেকে কিছু বেছে নিয়ে এবং অন্য সংগ্রাহকদের সংগৃহীত পালার কয়েকটি নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন পরবর্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৯২৬)। এখানে ১৪ টি পালা সংকলিত হয়েছে। *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই খণ্ডে এগারোটি পালা রয়েছে। *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এখানে রয়েছে কুড়িটি পালা।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ *নবশক্তি পত্রিকায়* 'পল্লীসঙ্গীতে পালা গান' রচনাটি প্রকাশ করেন। 'বিনোদের পালা', 'কটুমিঞার পালা' নামে দুটি পালার আনুপূর্বিক প্রকাশ না করে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। *নবশক্তি পত্রিকা*তে অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'শেওলার পালা' নামে আর একটি পালা প্রকাশ করেছিলেন। তবে এটির প্রকাশ সাল সঠিকভাবে জানা যায় না। ১৩৫১ সালে ময়মনসিংহ জেলার মশোয়া গ্রাম-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় *বাদ্যানীর গান* প্রকাশিত হয়। এটি আসলে 'মহুয়া' পালার পাঠান্তর।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পূর্ববঙ্গের মানুষ। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় গীতিকাগুলি প্রকাশের পূর্বেই তিনি পূর্ববঙ্গের গায়েন এবং বয়াতীদের মুখ থেকে বেশ কিছু গীতিকা শুনেছিলেন। ফলে প্রকাশিত গীতিকাগুলির অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি তাঁকে এই সব পালাগুলি সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পালা সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘ দিন অনুসন্ধান করে মোট ৪৮ টি পালা সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত পালাগুলি সাতটি খণ্ডে *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* নামে প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার ফার্মা কে এল, মুখোপাধ্যায় প্রকাশনা থেকে।

বদিউজজমান সম্পাদিত *মোমেনশাহী* (১৯৭১) গীতিকায় ছটি পালা সংগৃহীত হয়েছে- ১. সোনাই বিবি ২. চিলাই রানী ৩. মনোয়ার খাঁ দেওয়ান ৪. তোতা মিয়া ৫. মাধব মালঞ্চি কইন্যা ৬. গকুল চান ও আইধর চান। বদিউজজমান সম্পাদিত সম্পাদিত মোমেনশাহী গীতিকার ছটি পালাই নতুন।

গোপীনাথ সেন তাঁর *পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে* (১৩৯৪) গ্রন্থে 'পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা' শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের কিছু রচনাকে গীতিকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু যেগুলিকে গীতিকা বলে দাবি করেছিলেন সেগুলি আসলে আখ্যানকাব্য।

গাথার সংগ্রহ এবং প্রকাশের ইতিহাস ক্রমবহমান। ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর সংগ্রহ মালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগৃহীত হয়ে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তার মধ্যেও গাথা/ পালাগান/ গীতিকা বিভাগে এই জাতীয় রচনা সংগৃহীত হচ্ছে। মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের সম্পাদনায় দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে *পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা* নামক সংকলন।[২] এগুলিকে গীতিকা বলা যাবে কিনা সেটি নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই রয়েছে। সে প্রসঙ্গ দূরে রেখে এমন আশা আমরা করতেই পারি যে, সময়ের হাত ধরে এইভাবে আরো লোকসাহিত্যের অসংখ্য অজানা মণি-মুক্তা আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে। যা আমাদের সংস্কৃতিকে পুষ্ট করবে, আমাদের জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবে এবং আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবে।

উৎস নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুন, ২০১৫, পৃ. ১৮

২. হোসেন, মুহম্মদ আয়ুব (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা*, রাঢ় প্রকাশন বীরভূম, প্রথম প্রকাশ, (১ম খণ্ড ১৪১৯), (২য় খণ্ড ১৪২৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাটকে গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* ১০টি পালা *মৈমনসিংহ গীতিকা* নামে প্রকাশের মাত্র ২ বছরের মধ্যে ১৯২৫ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত 'কল্পতরু সারস্বত পরিষদ্' থেকে প্রকাশিত হয় *মৈমনসিংহ গীতিকার* সবথেকে আলোচিত ও জনপ্রিয় পালা 'মহুয়া'র কাহিনি অবলম্বনে সুশীলকুমার সেন প্রণীত পঞ্চাঙ্ক নাটক 'মহুয়া'। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ক কোনো তথ্য জানা যায়নি। ১৯২৯-এ রচিত হয় মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার প্রেরণায় মন্মথ রায়ের পঞ্চাঙ্ক নাটক 'মহুয়া' (প্রকাশ ১৯৩৯)। ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'মনোমোহন থিয়েটার'-এ তার অভিনয় হয়। এই নাটকের গানগুলি রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম এই নাটকের গানগুলি রচনা করেন। যে গানগুলি *মহুয়ার গান* নামে ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতার ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশনা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই সূত্রে আরো কয়েকটি তথ্য জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। ১৯৩১ সালে নজরুল ইসলাম মৈমনসিংহ গীতিকার মডেলে রচনা করেন আলেয়া গীতিনাট্য। ১৯৩১-এর ১৯ শে ডিসেম্বর 'নাট্যনিকেতন'-এ সেটি অভিনীত হয়। ১৯৩৯ সালে 'রঙমহল'-এ অভিনীত হল নজরুল ইসলামের 'মধুমালা'। 'গানে নাচে অভিনয়ে মধুমালা হয়ে উঠল একালের নব ময়মনসিংহ গীতিকা, আঞ্চলিক গীতিকার নতুন উত্তরণ ঘটল মিউজিক ড্রামা ড্যান্সড্রামার আঙ্গিকে।'[১] ১৯৪০ সালে নজরুল ইসলাম অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের জন্য রচনা করলেন আর একটি শ্রব্য গীতিনাট্য 'মহুয়া'।

এরপর ভারতবর্ষে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকে গীতিকার কাহিনির রূপায়নে দীর্ঘ ব্যবধান লক্ষ করা যায় (বাংলাদেশে তখন ধারা বজায় ছিল)। তবে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যে রূপান্তরে ধারাটি বজায় ছিল। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিভাস চক্রবর্তীর 'অন্য থিয়েটার' নাট্যদল এ দেশে গীতিকার কাহিনিকে আবার মঞ্চে আনে। বিভাস চক্রবর্তী প্রদত্ত নাট্যরূপ ও পরিচালিত 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' বাংলা থিয়েটারে ইতিহাস সৃষ্টি করে। বিভাস চক্রবর্তীর দেখানো পথে এরপর বাংলা থিয়েটারে আমরা পাচ্ছি- 'চন্দ্রাবতী' (কসবা অর্ঘ্য, ২০০২)- মণীশ মিত্র (নাট্যরূপ ও পরিচালিত), 'মলুয়া সুন্দরী পালা' (কল্যাণী কলামণ্ডলী, ২০০৫)- নাট্যরূপ- সমীর দাশগুপ্ত, 'কন্যা মলুয়া কাঞ্চন' (হিজল পুকুরিয়া জন জাগরণী, ২০০৫)- দেবব্রত দাস (নাট্যরূপ ও

পরিচালিত), 'কাজল রেখা' (বিডন স্ট্রিট শুভম্ নাট্য গোষ্ঠী, ২০০৬)- শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় (নাট্যরূপ ও পরিচালিত), 'দস্যু কেনারামের পালা' (কল্যাণী নাট্য চর্চা কেন্দ্র, ২০০৬)- কিশোর সেনগুপ্ত (নাট্যরূপ ও পরিচালিত), 'মহুয়া উপাখ্যান' (কোচবিহার কম্পাস নাট্যসংস্থা, ২০০৮)- দেবব্রত আচার্য (নাট্যরূপ ও পরিচালিত)। বর্তমান গবেষককে এক সাক্ষাৎকারে মাননীয় দেবব্রত আচার্য জানিয়েছেন মেদিনীপুর জেলার এগরা শহরে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার এক ওয়ার্কশপে তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন। এবং সেখানকার শিক্ষানবিশদের দিয়ে ১৭ দিনে 'কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যান' নামে গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটির তিনি নাট্যরূপ দেন ও মঞ্চায়ন করান। 'রানি কমলা' (ব্ল্যাইন্ড অপেরা, ২০১০)- (নাট্যরূপ- উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা- অশোক প্রামাণিক), 'কঙ্ক-লীলাবতী কথা' (নাট্যরূপ সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ির আনন নাট্য সংস্থা, ২০১৪), 'দস্যু কেনারামের পালা' (ব্ল্যাইন্ড অপেরা, ২০১৭)- অশোক প্রামাণিক (নাট্যরূপ ও পরিচালিত), 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (নয়ে নাটুয়া, ২০১৮)- গৌতম হালদার (নাট্যরূপ ও পরিচালিত), 'কঙ্ক ও লীলা' (কসবা অর্ঘ্য, ২০১৯- নাট্যরূপ মণীশ মিত্র, পরিচালনা- মেরী আচার্য), 'মহুয়া সুন্দরী পালা' (নান্দনিক বর্ধমান, ২০১৯)- সানি চট্টোপাধ্যায় (নাট্যরূপ ও পরিচালিত), 'সুন্দরী কমলা' (হাবড়া নান্দনিক, ২০২২)- দেবব্রত দাস (নাট্যরূপ ও নির্দেশক)।

এখানের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবকটি গীতিকার কাহিনির আধুনিক নাট্য রূপান্তর নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। ফলে কয়েকটি প্রযোজনার থেকে সামান্য দৃষ্টান্ত এনে আধুনিক রূপান্তরের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হল-

'সুশিক্ষিত ও উচ্চবংশজাত যুবকবৃন্দের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চার বিস্তার ও সোহার্দ্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে' ১৩৩০ সালে স্থাপিত হয় 'কল্পতরু সারস্বত পরিষদ'। এই পরিষদের সহঃ সভাপতি ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। তাহলে অনুমেয় নাটকটি প্রকাশের জন্য তাঁর মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। 'মহুয়া' নাটকের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন:

> শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র কাব্য-কথায় সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়া নাটক লিখিয়াছেন। তিনি নবীন সাহিত্যিক হইলেও-পুস্তকখানির স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করিয়া নিজের রচনার বাহাদুরী দেখাইতে সচেষ্ট হন নাই। মুলানুগত রচনায় তিনি মহুয়ার সৌন্দর্য্য নাট্য-শিল্প দ্বারা সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।[২]

বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে।

সুশীল কুমার সেনের 'মহুয়া' নাটকের আধুনিক রূপান্তরের উল্লেখযোগ্য দিক হল- গীতিকার বিপরীতে হেঁটে মহুয়াকে অনুজ্জ্বল করে নদের চাঁদকে উজ্জ্বল করে তোলা। বাংলা অধিকাংশ নাটক ও যাত্রার নায়কের ধারা মেনে এখানে নদের চাঁদকে সাহসী, বীর করে

দেখানো হয়েছে। পালায় মহুয়া নদের চাঁদকে ঘোড়ায় নিজের পিছনে বসিয়ে পালিয়ে ছিল, সেখানে নাটকে আমরা দেখছি নদের চাঁদই প্রস্তাব দিচ্ছে পালানোর। নদের চাঁদের নায়কোচিত গুণের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। পালায় সাধু তাকে নদীর জলে ফেলে দিলে সামান্য আত্মরক্ষাটুকুও যে নদের চাঁদ করতে পারে না, নাটকে তার মুখে শুনছি আমরা:

> মহুয়া। কি গভীর অন্ধকার, কোথায় যাবে? নদীতে পড়লে আর কি তুমি বাঁচ্‌বে।
> নদের চাঁদ। মহুয়া, নদীতে পড়তে আমার একটুও ভয় নেই, আমার ভাবনা শুধু তোমার জন্য।[৩]

হুমরার দলের লোকদের দ্বারা নদের চাঁদের হত্যার বিষয়টি পালাকার দ্বিজ কানাই-এর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে একটি শব্দও তিনি ব্যয় করেননি। সেখানে নাটকে বেদের দলের লোকজন তাকে হত্যার কথা বললে তার নির্ভীক, বলিষ্ঠ ঘোষণা:

> সর্দ্দার, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, আমি মৃত্যুর জন্য সে দিনই প্রস্তুত হয়েছিলাম, যেদিন তোমার কন্যাকে ভালবেসেছিলাম।[৪]

এমনকি শেষে মহুয়ার বুকের থেকে ছুরি তুলে নিয়ে নদের চাঁদ হুমড়াকে[র] হত্যার জন্য উদ্যত হয়। হুমড়ার প্রতি করুণাও করে! আরও আশ্চর্য শেষে নদের চাঁদ মহুয়ার মতো নিজের বুকে নিজে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে নায়কের মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়।

রূপান্তরে নদের চাঁদকেও ছাপিয়ে গেছে হুমড়া বেদে। এই নাটকে হুমড়া ব্রাহ্মণ সন্তান। শিশুকালে বেদেরা তাকে চুরি করে এনেছিল। নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থেকেই ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়াকে চুরি এমনটাই নাটককার দেখাতে চাইলেন। হুমড়া এবং তার দলের লোকজনকে নাটককার বেদে বললেও তাদের কথাবার্তা, ভাবনা চিন্তা এতখানিই পালিশ করা যে তাদের বেদে ভাবতেই আমাদের অসুবিধা হয়। তারা যেন নিম্নবিত্ত শ্রেণির, দরিদ্র পরিবারের সদস্য। এমনকি নাটকে তাদের কেন্দ্র করে নিম্নবিত্তের জাগরণও দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে হুমড়াকে মনে হয় রবীন্দ্রনাটকের ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর জাতীয় চরিত্র। রাজা নদের চাঁদের থেকে হুমড়া রাজসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করে (পুরুর কথোপকথন মনে ছিল?)। মহুয়া নদের চাঁদকে ভালোবাসে এটি জানার পর যতটা আহত হয়েছে তার পিতৃসত্তা তার থেকে বেশি লাঞ্ছিত হয়েছে তার বেদে দলের নায়কসত্তা। হুমরাদের ঘর না থাকলেও জন্মস্থানের প্রতি তাদের মমত্বের খামতি নেই। নাটকের এক অংশে সুকুমার রায়ের *অবাক জলপান*-এর সংলাপের ব্যর্থ অনুকরণ আমাদের অবাক করে।

মন্মথ রায়ের *মহুয়া* অতি অল্প সময়ে লেখা এবং মুদ্রিত হওয়ায় বহু অসঙ্গতিপূর্ণ, ঘটনাজটিল ও দুর্বল প্রকৃতির রচনা। এই নাটকের অতি নাটকীয়তা যাত্রাকেও হার মানায় এবং মাঝে মাঝে বিরক্তিরও কারণ হয়ে ওঠে। মন্মথ রায় নিজে মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের জেলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে তাঁর নাট্য রূপান্তর এমন অনুমান করা যায়।

মূল নাটক শুরুর আগের 'পূর্বাভাষ' অংশে উদ্ধৃত হয়েছে 'মহুয়া' গীতিকার 'নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা'র বিখ্যাত দৃশ্যটি। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় 'মহুয়া' পালার রোমান্টিকতার দিকটিই বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এ নাটকের চরিত্র পরিচিতি (এখানে 'ইঙ্গিত' নামে উল্লেখিত) অংশ থেকেই পাঠকের বিস্মিত হওয়া শুরু। নদেরচাঁদ [নদের চাঁদ] এখানে 'রাজা কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত শ্যামাসুন্দরজী বিগ্রহের সেবাইত'। রাজাকন্যা মহুয়াকে ডাকাতেরা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে নদেরচাঁদের বাবার মৃত্যু হয়। ফলে নদেরচাঁদ কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তীর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হয়। ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া নাটকে হয়ে গেল রাজকন্যা। আর নদেরচাঁদ মহুয়ার পিতার সম্পত্তির রক্ষা কর্তা।

গীতিকার নদেরচাঁদ মহুয়ার রূপেই প্রথমে মুগ্ধ হয়, রূপমুগ্ধতা পরবর্তীতে প্রেমে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু নাটকের নদেরচাঁদের কথাবার্তার মধ্যে প্রথম থেকেই একধরনের রুচিহীনতার, গ্রাম্যতার পরিচয় রয়েছে। সে যেন নারীর শরীরের প্রতি লালায়িত। তার মধ্যে কখনও রাজ বৈভবের প্রতি লোভ, কখনও মানবিকতার প্রকাশ দেখান লেখক। চরিত্রটিকে নায়ক করে তোলার বিষয়টিও লক্ষ করা যায়।

মহুয়ার আচরণে যুবতী বৈশিষ্ট্য প্রকাশের স্থানে শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। নদেরচাঁদকে নাচ দেখিয়ে খুশি করে তার কাছ থেকে আয়না দাবি করে সেটা নেয়। তারপর আচমকা পাথর দাবি করে। পাথর প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দরজীর বিগ্রহের প্রসঙ্গ আসে। মন্দিরে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ দেখে তার আহ্লাদ চাপে সেটি নেওয়ার। পর মুহূর্তে আয়নার উপর ছুরি দিয়ে আঘাত করে সেটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। ভাঙার কারণও অতি শিশুসুলভ। এই নাটকেও হুমড়া[রা] নির্লোভী ,আদর্শবাদী চরিত্র। তার মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্তের যন্ত্রণা ও উত্থান দেখানো হয়েছে। সুশীলকুমার সেনের নাটকের প্রভাব এখানে কাজ করেছে বলে মনে হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ শিশির মঞ্চে বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় প্রথম অভিনয় হয় 'অন্য থিয়েটার' নাট্যদলের 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'। মহম্মদ সাইদুর কর্তৃক সংগৃহীত এবং ঢাকা বাংলা একাডেমীর থেকে প্রকাশিত সংগ্রহে সংগৃহীত গীতিকা অবলম্বনে নাট্যরূপ

বিভাস চক্রবর্তীর নাট্যরূপ এটি। থিয়েটারের গতানুগতিক বিষয়ের বাইরে লোকসংস্কৃতির বৃহৎ ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাঙালি দর্শককে নতুনত্বের স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। তবে লোকসংস্কৃতিকে ভালোবেসে, তার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্য থেকে তিনি এই পালার মঞ্চায়নের সিদ্ধান্ত নেননি। সেকথা তিনি সততার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন।

গীতিকার মূল রূপ, চরিত্র, বা আখ্যানকে ভেঙেচুরে আধুনিক নাট্যের প্রয়োগে উপস্থিত করা হয়েছে মঞ্চে। আধুনিক মঞ্চের শর্তেই যে গীতিকার আখ্যানকে মঞ্চে আনা হয়েছিল সেটি স্পষ্ট হয়ে যায় 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'র গীতিকা পাঠ ও 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'র মঞ্চ পাঠের পার্থক্যকে পাশাপাশি রাখলে।

মূল গীতিকায় বন্দনা অংশ থেকে শুরু করে কাহিনি অংশকে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করে, পরের ঘটনাকে আগে এনে একটি মঞ্চ উপযোগী নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু গানের আয়তনকেও কমিয়ে আনা হয়েছে, একের গান অন্যের কণ্ঠে বসানো হয়েছে। মাধব ও মালঞ্চীর মিলনেই নাটকের যবনিকা পতন ঘটেছে কিন্তু গীতিকায় তার পরেও অনেকখানি অংশ ছিল। নাগরিক মঞ্চে অভিনীত সাধারণ নাটকগুলির তুলনায় এমনিতেই এই প্রযোজনা একটু দীর্ঘ। পালার আয়তন যাতে দীর্ঘ না হয় সে বিষয়ে বিভাস চক্রবর্তী যে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন সেটি বোঝা যায় তার এই কথাগুলি থেকে:

> পরিশেষে বলি, পালাটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। থিয়েটারে ব্যবহৃত উপাদানগুলি আধুনিক হলেও ব্যস্ত-সমস্ত চট্‌জলদি শহুরে মানসিকতার চাপে গ্রামীণ পালার সুর-তাল-লয় যেন ব্যাহত না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয়েছে। বাড়ি ফেরার তাড়া-খাওয়া ঘড়ি-দেখা দর্শকের হয়ত তাতে কিছুটা অস্বস্তি হবে, কিন্তু নান্যোপায়।[৫]

দেবব্রত আচার্যের 'মহুয়া উপাখ্যান'-এ গীতিকার আখ্যানকে সংলাপের মধ্যদিয়ে মঞ্চরূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই নাটকে পালাগানের উপস্থাপন রীতিকে বজায় রাখার চেষ্টা রয়েছে। গায়েন ও বাদকদের দল সব মঞ্চেই উপস্থিত থাকে। পালাটি শুরু হয় বন্দনা গান দিয়ে। তবে নাট্যকার পালাটির নাট্যরূপ দেওয়ার সময় আধুনিক চারপাশের মানুষকে গীতিকার আখ্যান ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায় সূত্রধারের এই কথাগুলি থেকে :

> সুধী দর্শকমণ্ডলী, শুরু করছি আমাদের আজকের পালাগান মহুয়া উপাখ্যান। এই পালার চরিত্ররা-মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা এরা সবাই প্রাচীন ময়মনসিংহ গীতিকার চরিত্র হলেও দেশ, কাল, সময়কে অতিক্রম করে নিজেদের অজান্তে এরা হয়ে ওঠে বর্তমানের চরিত্র—আর তখনই এই পালার স্থান, কাল, সময় প্রাচীন

ময়মনসিংহ গীতিকাকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে বর্তমানের জীবন্ত দলিল— সাধারণের জীবন গাথা—।[৬]

গীতিকার কাহিনির নাট্যরূপ দানে দেবব্রত আচার্য স্বাধীনতা নিয়েছেন। গীতিকার কথাকে খুব সামান্যই গ্রহণ করেছেন। পালার কাহিনিকে পরিবর্তন না করে তার মধ্যে আধুনিক নরনারীর জীবন সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাট্যরূপে আখ্যানকে বেশ সিনেমাটিক ও নাটকীয় করে তোলা হয়েছে। স্বাধীন কাহিনি নির্মাণ করতে করতে নাটককার মাঝে মাঝে গীতিকার কাহিনির কাছে ফিরে আসায়, দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঠিকভাবে সাধিত হয়নি। এই নাটকে সূত্রধারের বর্ণনাকে খুবই কমিয়ে দিয়ে অভিনয়ের ক্ষেত্রটিকে ছেড়ে রাখা হয়েছে বেশি করে। এমনভাবে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে যাতে আখ্যানটিকে লোকনাট্যের আখ্যানের মতো সহজেই বাড়ানো-কমানো যায়। লিয়াকত আলি লাকির 'সোনাই মাধব' নাটকেও এই বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিশোর সেনগুপ্ত-এর 'দস্যু কেনারামের পালা' এবং অশোক প্রামাণিকের 'দস্যু কেনারামের পালা'য় গীতিকার অন্তমিল যুক্ত কাব্যিক ভাষাকেই বজায় রাখা হয়েছে। গীতিকার উপস্থাপন রীতি বজায় রেখে এখানে সূত্রধার কাহিনি বর্ণনা করেন। কাহিনির মধ্যেকার অভিনয় যোগ্য স্থানে চরিত্ররা বাচিক ও শারীরিক অভিনয় করে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যান। নিজেদের সংলাপ তারা নিজেরাই বলেন। গীতিকার আখ্যানের যে অংশকে গানে বিস্তৃতি দেওয়া সম্ভব সেখানে গানের মাধ্যমে বিস্তৃতি দেওয়া হয়েছে। গায়েন, বাদকেরা মঞ্চের উপরেই বসেন। তবে মঞ্চের প্রয়োজনে সামান্য কিছু কিছু অংশের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, বাদও দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো জায়গা।

'নয়ে নাটুয়া' দলের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' আধুনিকতায় মোড়া। প্রসেনিয়ামে দর্শক আকর্ষণের কোনো উপাদানকে বাদ দেওয়া হয়নি। এই প্রযোজনার মহড়া দেখে দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় যে সমালোচনা লিখেছিলেন তা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হল এই নাট্যের আধুনিকতার বিষয়টি বোঝাতে- "লোকনাচে যখন জুড়ে যায় রাপ। শরীরী বিভঙ্গ পুবের হাওয়ায় মাখামাখি হয়েও খানিক পশ্চিমি। অপেরার ধাঁচে হাতে ওঠে মাইক্রোফোন। করিওগ্রাফ টপকায় লোক-অঙ্গের বেড়া।"[৭] গানগুলিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বিশেষ করে মহুয়াকে পাওয়ার আশায় নৌকার সদাগর যেভাবে গান গায় তাতে মনে হয় তিনি পালাগান গাইছেন না, গাইছেন আধুনিক বাংলা ব্যান্ডের গান। উল্লেখ্য 'নগরকীর্তন'-এর বিখ্যাত 'লালা...লালা...লা...' সুরটি এখানে ব্যবহৃত।

সানি চট্টোপাধ্যায় পালাগানের যাবতীয় শর্ত বজায় রেখে হিন্দু-মুসলিমের জাতিগত বিদ্বেষকে হাজির করেন নদের-চাঁদ ও মহুয়ার ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য। হুমরা এখানে

মুসলমান। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতীক নদের চাঁদের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে তার জাত্যাভিমান বাধা দেয়:

খোদা না চায় এক জমিনে বাঁধতে আমার ঘর।
জাতশত্রু হাতে না করি আপন ছেড়ীরে পর।।[৮]

নাটক শেষ হয় ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী দিয়ে:

আজিও শুনি ধম্মের নামে বড় হানাহানি
ভিন্ন নয় তা জলের নামে আরেক কইলে পানি।।
উপর হতে দ্যাখছেন তিনি ভায় ভায়ে মারে।
শিশুর চোখেও জাত দেইখ্যা মায়ের কোল কাড়ে।।
বিচার কইর‍্যা দেইখ্যো ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
এই কইয়াই সাঙ্গ করি মহুয়া পালার গান।।[৯]

আমাদের মনে পড়ে যায় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, গুজরাট দাঙ্গা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতি দাঙ্গার স্মৃতি।

দেওয়ান ভাবনা পালাকে 'সোনাই মাধব' নাম দিয়ে গীতিনাট্য রূপ দিয়ে তার রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। সংগীত পরিচালক ছিলেন- দীনেন্দ্র চৌধুরী। গীতিকার- ভাস্কর বসু। যে-সমস্ত শিল্পীরা এই পালার গানগুলি গেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তীর প্রমুখ। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ 'মহুয়া সুন্দরী' নামক একটি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। পরিবেশক- কৃষ্ণা মিউজিক। গীতিনাট্যের গানগুলিকে সাজান- দেবাশিস ব্যানার্জি। কণ্ঠে ছিলেন- শুক্লা মজুমদার, কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, মুরারি কুমার, পলাশ কুমার এবং রেখা ভট্টাচার্য।

অধ্যাপক অরুণকুমার বসু 'কাজলরেখা' ও 'দেওয়ান ভাবনা' পালাকে যথাক্রমে 'কাজলরেখা' এবং 'সোনাই মাধব' নামে গীতিনাট্য রূপ দিয়েছিলেন। তিনি 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে নাথ গীতিকারও গীতিনাট্য রূপ দিয়েছিলেন।

২০১৭-র ৮ অক্টোবর ঢাকুরিয়ার অবন মহলে ময়মনসিংহ প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কঙ্কলীলা পালার নৃত্যনাট্য পরিবেশনের কথা। সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন- ডা: কৃষ্ণা হালদার ও সুবিমল জয়ন্তী। নৃত্য পরিচালনা ও পরিবেশনা- স্বপন মিত্র ও শিঞ্চন কলাতীর্থ। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন- পি.সি. সরকার (জুনিয়ার) ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু।

একটা বিষয় লক্ষ করলে বোঝা যায় গীতিকার কাহিনির নাট্যরূপের যে দৃষ্টান্তগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি প্রায় প্রতিটি মঞ্চায়নের জন্য দলের নির্দেশকই নাট্যরূপ দিয়েছেন।

কোনো গীতিকার আখ্যান ভালো লেগেছে বলে কোনো নাটককার সেই কাহিনিকে আশ্রয় করে নাটক লিখলেন, কোনো নাট্যদল পরবর্তীতে সেটিকে গ্রহণ করলেন অভিনয়ের জন্য এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের 'কঙ্ক-লীলা কথা' ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। গীতিকার কাহিনি আশ্রয়ী এমন স্বাধীন শিল্প নির্মাণ লেখকের উচ্চ প্রতিভার পরিচায়ক।

উৎস নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রায়, বিশ্বনাথ, রায়, ছন্দা (সম্পাদিত), *বাংলা লোকনাট্য ও রঙ্গমঞ্চ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৩; জুলাই ২০১৬, পৃ. ৫২

২. সেন, সুশীলকুমার, মহুয়া, কল্পতরু সারস্বত পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯২৫ ভূমিকা

৩. ঐ, পৃ. ৪২

৪. ঐ, পৃ. ৬০

৫. চক্রবর্তী, বিভাস, *মাধব মালঞ্চী কইন্যা প্রস্তুতি ও নির্মাণ*, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১, পৃ. ২১

৬. *গ্রুপ থিয়েটার*, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), ৪০ বর্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৮, পৃ. ১৭৮

৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, অনলাইন সংস্করণ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৮. চট্টোপাধ্যায়, সানি চট্টোপাধ্যায়, *মহুয়া সুন্দরী* (পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১৫

৯. ঐ, পৃ. ৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

যাত্রায় গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

যাত্রার আসরে মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিকে প্রথম আনেন 'পালাসম্রাট' ব্রজেন্দ্রকুমার দে। গীতিকার কাহিনি নিয়ে তার প্রথম প্রয়াস 'চাঁদের মেয়ে' (১৯৩৬)। 'ঈশাখাঁ দেওয়ানের পালা' বা 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি' কাহিনি অবলম্বী এই যাত্রাপালার সাফল্য তাঁকে এতই উৎসাহিত করেছিল যে পরবর্তীতে তিনি ন'টি যাত্রাপালা লিখলেন গীতিকার কাহিনি নিয়ে। 'কাঞ্চনমালা'র কাহিনি অবলম্বনে লেখেন 'সমাজের বলি' (১৯৪৪)। 'রূপবতী' থেকে 'গাঁয়ের মেয়ে' বা 'রূপবতী' (১৯৫১)। 'কঙ্ক ও লীলা'কে আশ্রয় করে তিনি লিখলেন 'ভাগ্যের বলি' (১৯৫৮)। 'দেওয়ান ভাবনা' অবলম্বনে 'সোনাই দীঘি' (১৯৫৯)। গীতিকার কাহিনি অবলম্বনে রচিত যাত্রার মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় পালা এটি। 'কমলা' পালা অবলম্বনে 'লোহার জাল' (১৯৬০), 'চন্দ্রাবতী' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' অনুসরণে লিখলেন 'কবি চন্দ্রাবতী' (১৯৬১)। 'মলুয়া' পালা থেকে তিনি তৈরি করলেন 'সতীর ঘাট' (১৯৬১), 'মহুয়া' পালা থেকে 'মহুয়া' (১৯৬১)। 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'-এর কাহিনি নিয়ে 'ঝড়ের দোলা' (১৯৬৮), 'সুজা তনয়ার বিলাপ' অবলম্বনে অনেক 'অনেক রক্ত ছড়িয়ে' [মগের মল্লুক] (১৯৭০)।

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'কাজলরেখা' পালা অবলম্বনে লিখেছিলেনে 'কাজলরেখা' (প্রকাশ সাল জানা যায়নি)। প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'মলুয়া' পালা অবলম্বনে লেখেন 'মহব্বতের ইনাম', 'চন্দ্রাবতী' গীতিকা অবলম্বনে 'বেহেস্তের ফুল'। রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় 'মহুয়া' গীতিকা অবলম্বনে লেখেন 'মহুয়া সুন্দরী' (নামটির যাথার্থ্য নিয়ে সন্দেহ রয়েছে)। উল্লেখ্য এখানে শুধু গীতিকার কাহিনি অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত যাত্রাপালার কথা জানা গেছে সেই তথ্যগুলিরই উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবকটি গীতিকার কাহিনির আধুনিক যাত্রা রূপান্তর নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। ফলে কয়েকটি প্রযোজনার থেকে সামান্য দৃষ্টান্ত এনে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হল-

ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর 'চাঁদের মেয়ে' যাত্রাপালার ভূমিকায় লিখেছিলেন:

> চাঁদ রায়ের আদরের দুলালী সোনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী লইয়া নাটকখানি রচিত। যাঁহারা "চাঁদের মেয়ে" পড়িতে গিয়া মানসিংহ ও কার্ভালোকে খুঁজিবেন, তাঁহাদের

> কাছে আমার বক্তব্য এই, আমি সোনার জীবন-নাট্য লিখিয়াছি, চাঁদ-কেদারের কাহিনী লিখি নাই। সমাজের শাণিত খড়্গাঘাতে হিন্দু নারীর যে অসহায় কান্না আমাদের ধ্বংসের পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই আমি রূপ দিতে চাহিয়াছি।[১]

বাংলার বারো ভুঁইয়াদের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ স্বাধীন 'ঐতিহাসিক নাটক' নির্মাণ করেছেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে।

মূল গীতিকায় যেখানে ঈশা খাঁর বীরত্বই প্রধান ছিল সেখানে হিন্দু বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। মূল পালার কালিদাস গজদানি (ঈশা খাঁর পিতা), কেদার রায়ের দুই কন্যা ও তাদের কাহিনি অনুপস্থিত। যাত্রাপালায় কেদার রায়ের দুই কন্যার স্থলে দুই পুত্রের দেখা পাই আমরা। কেদার রায়ের ভগ্নী সুভদ্রা এখানে হয়ে গেছেন- কেদার রায়ের দাদা চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ, বন্দি করে ঈশা খাঁকে দিল্লিতে আকবরের কাছে প্রেরণ এই ঐতিহাসিক অংশ যাত্রাপালায় নেই। গীতিকায় আকবর ঈশা খাঁকে মুক্তি দিলে দিল্লি থেকে কোশা করে প্রত্যাবর্তনের সময় কেদার রায়ের ভগ্নী সুভদ্রার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। সুভদ্রা প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে ঈশা খাঁর প্রতি। শেষে সুভদ্রারই পরিকল্পনা মাফিক নির্দিষ্ট দিনে স্নানরত সুভদ্রাকে অপহরণ করে নিয়ে বিয়ে করেন ঈশা খাঁ।

যাত্রাপালায় উল্টে ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজের গোপন, ভীরু ভালোবাসার কথা এনায়েৎ-এর চাপে প্রকাশ করে তার হাত দিয়ে বিবাহ প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন চাঁদ রায়ের কাছে। যে পত্রকে কেন্দ্র করে এই যাত্রাপালার যাবতীয় ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। স্বর্ণময়ীকে বিয়ে করার প্রস্তাবে ঈশা খাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা মিশে ছিল। কিন্তু হিন্দু বিধবা নারীকে মুসলমানের বিবাহ করার প্রস্তাবকে অমর্যাদা ও সম্মানহানির মনে করে চাঁদ রায় ও কেদার রায় ঈশা খাঁর রাজ্যকে আক্রমণ করে শ্মশানে পরিণত করে দেয়। পাল্টা অস্ত্র ধরে ঈশা খাঁ। শেষ পর্যন্ত আলেয়ার মধ্যস্ততায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

এই যাত্রাপালার অন্যতম দিক হিন্দুর জাত্যাভিমান, পুরুষের বীরত্ব, নিম্নবিত্তের প্রতিশোধ স্পৃহা, সর্বোপরি জাতপাত, সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবিকতার প্রতিষ্ঠা। নারীর বীরাঙ্গনা মূর্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায় কেশার মায়ের সংলাপে। শৈশবে বিবাহ, স্বামীর অকাল মৃত্যু তাকে পুনরায় বিবাহ দান নিয়ে প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের মধ্য দিয়ে লেখক আসলে বাল্য বিবাহ, বিধবাদের প্রতি সমাজের অমানবিক বিধানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি সমাজ বনাম ব্যক্তি, মানবতা বনাম সংস্কার, শাস্ত্র বনাম যুক্তির

দ্বন্দ্ব এই যাত্রাপালায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে। স্বর্ণময়ী ও আলেয়ার হিন্দু-মুসলিম দুই নারী পুরুষের ছত্রছায়ায় না থেকে স্বাধীনভাবে সমাজের বাইরে গিয়ে একত্রে বাঁচার সংকল্প নারীর স্বাবলম্বী ও আপন ভাগ্য জয় করার সংকল্পকে চিহ্নিত করে। অত্যাচারীর পরিবেশ থেকে উঠে আসে মানবিকতার মুখ এটি ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালার একটি অন্যতম প্যাটার্ন। পালার এই দিকটি তৎকালীন দর্শকের হৃদয়কে সহজেই জয় করেছিল।

প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণের বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীপুরের রাজগুরু শ্রীমন্ত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সংস্কার ও প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে যেতে পারেননি বিধবা বিবাহ সম্পর্কে। রাজ গুরুর পদের বিনিময়েও তিনি শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারণ করেননি। আবার এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহার বিষয়টিকে হাজির করা হয়েছে। জাত-পাতের দলাদলিতে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে হারানোর বেদনা এনায়েৎ-কে কিছুটা করে তোলে কূটকৌশলী। চাঁদ রায়ের মধ্যেকার সামাজিক সত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বও চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে কেদার রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র চম্পকের কথা ও আচরণে সে শিশু নাকি সমাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তা নিয়ে সন্দেহ জাগে।

নারীর অসহায়, করুণ কাহিনি উঠে এসেছে 'সমাজের বলি' (১৯৪৪) তেও। প্রাচীন পল্লীগাথা কাঞ্চনমালার করুণ কাহিনি অবলম্বে 'সমাজের বলি' রচিত। অথচ 'সমাজের বলি'কে একটি কাল্পনিক যাত্রাপালা বললেও ভুল হয় না। এই যাত্রাপালার অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। কাঞ্চনকে মাঝে রেখে কাজলদীঘি ও দুধসায়র এই দুই রাজ্যের দুটি রাজ পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের আখ্যানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

পালায় কাঞ্চনমালার জন্মের অলৌকিক কাহিনি, তারপর তার বিয়ে নিয়ে জটিলতার বিষয়টি বড়ো জায়গা জুড়েছিল। সেখানে যাত্রাপালার প্রথমেই আমরা যৌবনবতী কাঞ্চনমালাকে পাচ্ছি। সমাজের বলি যাত্রাপালার মূল কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সমাজের উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের অবস্থানের পার্থক্য। কাঞ্চন গরিব গদাধরের কন্যা। রাজার পুত্রের সঙ্গে তার প্রণয়কে মেনে নিতে পারে না রাজা থেকে শুরু করে সমাজ। আর তার থেকেই এই দ্বন্দ্বের সূচনা। কাঞ্চনের কথায় গরিবের হতাশা ঝরে পড়েছে:

> সে যে রাজা, অনেক উচ্চে তার আসন। আমরা গরীব, আমাদের পিঠে তারা লাথি মারবে, আর তার বিচার হবে কি?[২]

কাঞ্চনকে প্রতিবাদী নারী করেই আঁকা হয়েছে এই যাত্রাপালায়।

অত্যাচারীর পরিবেশ থেকে এখানেও মানবিকতার মুখ উঠে এসেছে। হলায়ুধ এই পালায় এমনি এক চরিত্র। যিনি রাজার নির্দেশে দুধসায়র অধিকার করতে এসেছেন। তিনি সেনা প্রধান। তিন মাস অতিক্রান্ত। তাদের পক্ষে অর্ধেক সেনা মৃত, অন্যরা ক্লান্ত। কিন্তু

অন্যায় যুদ্ধে তিনি দুধসায়র জয় করতে চান না। নকুল চোরা পথে, ছলনার আশ্রয় নিয়ে জয় আনতে চায়। দুধসায়রের রাজা শহীদ-স্মৃতি-তর্পণ করবেন। আজ তিনি এবং তার সৈন্যদল অস্ত্র ধরবেন না। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নকুল তাদের সকলকে বন্দি করতে চায়। এই পরিকল্পনা শোনার পর হলায়ুধ জানান:

> কিন্তু আমার সৈনাপত্যে তা হবে না বুদ্ধিমান! আমি মহারাজকে একদিনের অবসর দিয়েছি। আজ তিনি আমাদের বন্ধু। তাঁর অনিষ্ট করা দূরের কথা, যদি তাঁর প্রয়োজন হয়, আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে তাঁর ধর্মানুষ্ঠানে সহায়তা করবো।[৩]

তিনি তার ধর্ম থেকে চ্যুত হতে চান না।

রূপকথাধর্মী রূপবতী পালার কাহিনি-আশ্রয়ী 'গাঁয়ের মেয়ে' বা 'রূপবতী' (১৯৫১) হয়ে উঠেছে ছদ্ম 'ঐতিহাসিক নাটক'। এই পালার অধিকাংশ চরিত্র কাল্পনিক। রামপুর এখানে রূপসাগর, রাজচন্দ্র হয়েছেন জয়চন্দ্র। নবাব সরফরাজ খাঁ রূপসায়ের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা রূপবতীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে জোর করে বিয়ে করতে চায়। দুর্বল রাজা জয়চন্দ্র নবাবের বিরোধিতা করতে পারে না, কিন্তু নারী গুণবতী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন বিধর্মীর হাতে কন্যাকে তুলে না দিয়ে কোনো হিন্দু পাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে (মূল পালায় ছিল রাজা সকালে উঠে প্রথম যার মুখ দেখবেন তার হাতে নিজের কন্যাকে সমর্পণ করবেন)। এখানে নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। শেষে মদনের সহায়তায় বহু কষ্টে কন্দর্প নামক এক যুবকের সন্ধান যদিও মেলে কিন্তু দেখা যায় কন্দর্প রূপবতীদের জ্ঞাতি। গীতিকার রূপকথা সুলভ বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসে এই যাত্রাপালা নিম্নবিত্তের সততার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে।

'ভাগ্যের বলি' (১৯৫৮) যাত্রাপালাটি 'কঙ্ক ও লীলা'র রোমান্টিক ট্র্যাজিক প্রেম আখ্যানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও কল্পনার অবাধ বিচরণে সেটি 'কাল্পনিক নাটক'-এ পরিণত হয়েছে। এই যাত্রাপালাটিতে রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারা* ও *রক্তকরবী* নাটকের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। যাত্রাপালায় বেশ কিছু নতুন চরিত্রের সংযোজন করা হয়েছে। এখানে কঙ্ক ও লীলার প্রেম অপেক্ষা সামাজিক আচার-বিচার, নিয়ম-নীতি সংস্কার অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। আরও আশ্চর্য এখানেও আমরা খুঁজে পাবো রাজা-রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যাদের! যারা যাত্রাপালায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এমনকি কঙ্ক ও লীলার প্রেম জীবনের বৃত্তেও তাদের উপস্থিতি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে আখ্যানকে ঐতিহাসিক নাটকের কাছে নিয়ে চলে যায়।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সোনাই দীঘি' (১৯৫৯) বাংলা যাত্রাপালার ইতিহাসে এক মাইলস্টোন। জনপ্রিয়তার কথা ধরলে এই যাত্রাপালার সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে এমন

নাম খুবই কম ('চাঁদের মেয়ে'ও প্রবল জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু 'সোনাই দীঘি'র মতো প্রচারের আলোকে আসতে পারেনি মিডিয়ার রমরমার অভাবে)। এই যাত্রাপালার ভূমিকায় গ্রন্থাকারের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

> ছত্রিশ বছর ধরিয়া আমি যাত্রাজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও দেখি নাই কোন একটি বিশেষ নাটকের অভিনয় দেখার জন্য এমন দুর্বার জনস্রোত, আর মুদ্রিত নাটকের জন্য এমন হাজার হাজার পত্রের তাগিদ।[৪]

এই যাত্রাপালার আধুনিকতার অন্যতম দিক হল গীতিকার চিরকালীন শোষকের প্রতিমূর্তি ভাবনা কাজিকে বিশেষ ঐতিহাসিক কালখণ্ডের মধ্যে সীমায়িত করা। গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ এই যাত্রাপালার চরিত্র হয়ে উঠেছেন। আরও কিছু কল্প ঐতিহাসিক চরিত্র সংযোজন করা হয়েছে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, সংকীর্ণতার বিষয়টি তুলে ধরতে মল্লিকা, কেতকীর মতো চরিত্র হাজির করা হয়েছে। মুক্তকেশীকে (সোনাইয়ের মামিমা) করে তোলা হয়েছে প্রতিবাদী নারী মুখ। পাশাপাশি হিন্দু সমাজের জাতপাতের ভেদাভেদ, পুরুষের শৌর্যবীর্য, বীরত্ব প্রদর্শনের বিষয়টি সে যুগে দর্শকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে বহু রজনী সাড়াম্বরে যাত্রা অভিনয়ের দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিল 'সোনাই দীঘি'।

'চন্দ্রাবতী' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' এই দুই গীতিকার আখ্যানকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে 'কবি চন্দ্রাবতী' (১৯৬১) যাত্রাপালায়। পালার ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন:

> কবির কাহিনী যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া যাত্রার আসরে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।[৫]

দস্যু কেনারাম এখানে বংশিদাসের পুত্র এবং চন্দ্রাবতীর ভাই। এই যাত্রাপালাতেও পাওয়া যাবে কিছু কল্প রাজ ব্যক্তিত্বকে (ঐতিহাসিক ছোঁয়া)। যুদ্ধ-বিগ্রহও দেখানো হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মসমন্বয়ের বাণী এই যাত্রাপালাতেও বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে।

'সতীর ঘাট' (১৯৬১)-এ মূলের মতো হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য ও ত্যাগের বিষয়টি প্রাধন্য পেলেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টি এই যাত্রাপালায় অনেখানি জায়গা নিয়েছে। মুশা খাঁ মসনদ আলি, আদিল, আনোয়ার, জানকীবল্লভ, আলিফজল, দিলমহম্মদ, ফর্মান খাঁ, বদর খাঁ ইত্যাদি চরিত্রের নাম শুনে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে ইতিহাস ও কল্পনাকে কীভাবে মিশানোর চেষ্টা করা হয়েছে মলুয়ার আখ্যানে। গীতিকার দুর্বলচেতা চাঁদ বিনোদ এখানে সাহসী, বীর, নায়ক।

'মহুয়া' গীতিকার যাত্রারূপ পেতে দেরি হওয়ার কারণ বুঝি এই পালার পূর্বে মঞ্চে চলে আসা। 'মহুয়া' গীতিকার মূল কাহিনির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমার দের 'মহুয়া' (১৯৬১) যাত্রার

কাহিনির মিল খুবই কম। যাত্রায় মোট আঠারোটি চরিত্রের দশটি কাল্পনিক। মূল পালার সওদাগর সাধু এখানে ধর্মকেতু নাম নিয়েছে। অন্য সাতটি চরিত্র মূল পালার নামেই যাত্রায় বজায় রয়েছে। এখানে সুজন হুমড়ো সর্দার ও মানিকের ভাগ্নে। উল্লেখ্য মহুয়া এখানে বামুন ডাঙার রাজা সঞ্জয় রায়ের কন্যা।

'মহুয়া' যাত্রার প্রথমেই নিম্নবিত্তের সঙ্গে উচ্চবিত্তের দ্বন্দ্বকে হাজির করা হয়। কাঞ্চনপুর থেকে এসে নদের চাঁদ আশ্রয় প্রার্থনা করে বামন ডাঙার রাজা সঞ্জয়ের কাছে দাদা ধর্মকেতুর হাত থেকে রক্ষা পেতে। কারণ তার দাদা রাজপথে জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখান। তিনি তাকে বলেন তার ভাই তার মৃত্যুর কারণ হবে। নদের চাঁদ শত্রুরাজ্যের মানুষ হওয়ায় রাজা ইতস্তত করতে থাকেন আশ্রয় দিতে। কিন্তু রানি ধরিত্রী রাজাকে স্পষ্ট ভাষায় জানান:

> যাও রাজা। বিপন্নকে রক্ষা করতে যদি না পার, সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাও।[৬]

সঞ্জয় রাজ আশ্রয় দেন নদের চাঁদকে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের ছবি ব্রজেনবাবুর মন থেকে মুছে যায়নি। দেশভাগের পর তাঁর জন্মভূমি(ফরিদপুর) তাঁর কাছে হয়ে গিয়েছিল বিদেশ, বিভুঁই। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-এর বহু মানুষ সেদিন এমনি আশ্রয়ের সন্ধানে ছিল।

মূল পালায় হুমরা কেন ব্রাহ্মণের ছয় মাসের কন্যা চুরি করেছিল তার কোনো কারণের উল্লেখ নেই। এখানে ব্রজেনবাবু উচ্চবিত্তের প্রতি নিম্নবিত্তের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি যুক্ত করেছেন। হুমড়া বেদের ছেলে মদনকে মিথ্যা চোর সন্দেহে আটক করা হয় এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রতিশোধ নিতে বেদের দল চুরি করে মহুয়াকে। নাটকের প্রাণ হল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য লেখক এখানে জুড়ে দেন কাঞ্চনপুরের নমঃশূদ্র রাজা করঞ্জাক্ষের পুত্র পুণ্ডরীকের সঙ্গে বামুন ডাঙার ব্রাহ্মণ রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে সেই রাজ্য হস্তাগত করার কথা। কিন্তু পিতার কুমতলবে মোটেই মত দেয় না রাজপুত্র পুণ্ডরীক।

'ঝড়ের দোলা' (১৯৬৮)কে লেখক ঐতিহাসিক নাটক বলেছেন। বাংলার মহীয়সী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে যাত্রাপালাটি উৎসর্গ করা হয়। লেখক দাবি করেন সখিনা বিবির কাহিনি নিয়ে গান, কবিতা, ছড়া লেখা হলেও নাটক লেখা বোধ হয় প্রথম। তিনি সখিনা বিবির বীরাঙ্গনা মূর্তিকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। রায় বাঘিনীকে নিয়ে বাঙালির উৎসাহের অন্ত নেই কিন্তু সখিনা বিবিকে কেন আপামর বাঙালি বিস্মৃত হয়েছেন সেটা নিয়ে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। সখিনা বিবির সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ নিয়ে এই যাত্রা আসলে লেখকের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগেরই দৃষ্টান্ত। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সখিনা বিবি এই যাত্রাপালার কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়। ফিরোজ খাঁ-র প্রতি যেন লেখক একটু বেশি আলো ফেলেছেন।

কালীদাস গজদানির পুত্রবধূ সিরাজী। কালীদাস গজদানি ধর্মান্তরিত হলে তার নাম হয় সুলেমান খাঁ। পূর্বে যেহেতু সুলেমান ছিলেন হিন্দু সেজন্য মসজিদে গেলে সিরাজির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন ওমর খাঁ-র কন্যাদের মতো অনেকেই। ওমর খাঁ বলেন- 'এরা কাফের, আধা মুসলমান। এদের ধারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে গুণাহ্ হয়।' এই কথায় সিরাজী ক্ষুব্ধ হচ্ছেন এবং সখিনাকে পুত্রবধূ করার প্রতিজ্ঞা করছেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। লেখক মূল কাহিনি থেকে সরে এলেন। মূল কাহিনিতে মা পুত্রের বিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। পুত্র কিছুতে কোনো নারীর পাণিগ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিল না। শেষে সখিনার চিত্র দেখে তার রূপে মুগ্ধ হন এবং বিয়ে করেন। এখানে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হল। সিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব ঘটনার কেন্দ্রে চলে এলো।

সুজা তনয়ার দুঃখের কাহিনি নিয়ে পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু গাথা, পালাগান রচিত হয়। গীতিকায় সংকলিত অংশটি মূল পালার খণ্ডাংশ বলে সম্পাদক মহাশয় দাবি করেছেন। যে পালাটি সাহ সুজার পত্নী পরিভানু সম্বন্ধেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক পালাগান রয়েছে এমনও তথ্য পাওয়া যায়। 'অনেক রক্ত ছড়িয়ে' ['মগের মল্লুক'] (১৯৭০) যাত্রাপালাটি সেই কাহিনি নিয়ে রচিত 'ঐতিহাসিক নাটক'।

সুজা কিছুদিন চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন ফরাসী পর্যাটক বার্ণিয়ারসহ অনেক ঐতিহাসিক এই কথা স্বীকার করেছেন। পালায় ব্রজেনবাবু সেটাই দেখিয়েছেন। বাংলা থেকে পালিয়ে এসে সুজা চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন। লেখকের ইতিহাস পাঠের প্রমাণ তার বিভিন্ন রচনার মতো এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। চার্ল্‌স স্টুয়ার্টের অনুমান সুজা চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমার নাফ্ নদীর পরপারে উপনীত হলে আরাকানের রাজপ্রতিনিধি তাকে অতিশয় সম্মানের সঙ্গে আরাকানে নিয়ে যান। এই ঘটনাকেও এখানে রাখা হয়েছে।

পীরবানুর রূপে মুগ্ধ মুহম্মদের মুখে কবি বিদ্যাপতির রূপানুরাগ পর্যায়ের একটি বৈষ্ণব পদের অংশ বিশেষ ব্যবহার করা হয়েছে:

আধ জনম হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
সো হি মধুর বোল স্রবণ হি শুননু,
স্মৃতিপটে পরশ না গেল।[৭]

এই বিষয়টি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। লেখক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলির গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। বাংলা যাত্রাপালা যারা দ্বিজেন্দ্র পরবর্তী যুগে লিখেতে এসেছেন তাদের ঐতিহাসিক যাত্রাপালায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সাধারণত চোখে পড়ে। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, আর হিন্দু জাতীয় চেতনা। মুসলমান চরিত্রে এবং রাজ অন্তঃপুরে হিন্দুদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহারের হিন্দু

সংস্কারে মোড়া। 'সমাজের বলি'তে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের প্রভাবের কথা বলা হয়েছিল। আর এই নাটকে রয়েছে *বিসর্জন* নাটকের প্রভাব।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি এই যাত্রাপালাতেও রয়েছে। আমিন চরিত্রটিকে নির্ভীক, সৎ-সাহসী করে অঙ্কন করা হয়েছে। অত্যাচারীর পরিবার, পরিবেশ থেকে বিরোধী কণ্ঠস্বর, মানবিকতার সুর এই নাটকেও শোনা যায়। আলমগীরের হৃদয়হীনতার মধ্যে মহম্মদ, শাহাবাজ, আমিনবেগ। সুধর্মার রাজত্বে সুকর্মা, বিল্লী।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর 'মহব্বতের ইনাম' ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সতীর ঘাট'-এর ব্যর্থ অনুকরণে নির্মিত এক অসংলগ্ন, অতি নাটকীয় যাত্রাপালা। 'মলুয়া' গীতিকার আখ্যান এখানেও ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে। মূল গীতিকার আখ্যান কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে তার ইঙ্গিত দিতে যাত্রাপালার ভূমিকা অংশের সামান্য তুলে দেওয়া হল:

> মহব্বতের ইনাম ঐতিহাসিক নাটক। মৈমনসিং গীতিকার 'মলুয়া' নামক পল্লীগাথার নাট্যরূপ ভালোবাসাহীন সমাজে পবিত্র ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, হিন্দুনারীর ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষায় খিজিরপুরের মুসলমান নবাব মুসা খাঁর বিরাট ত্যাগের ঐতিহাসিক মণ্ডিত ঐতিহাসিক কাহিনীর সকরুণ দৃশ্যকাব্য।[৮]

বাঙালির ঐতিহ্য, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টি এই নাটকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। মুসা খাঁকে করে তোলা হয়েছে বাঙালি পিতা। সমাজের সামান্যা নারী মলুয়ার জন্য এই নাটকের ঐতিহাসিক অংশ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এটি বড়ো বেশি অবাস্তব বলে মনে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের, বিশেষ করে সাজাহান নাটকের প্রভাব এই যাত্রাপালায় প্রকট।

উৎস নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *চাঁদের মেয়ে,* ডায়মণ্ড লাইব্রেরী ,কলকাতা ,সপ্তম সংস্করণ, ১৩৬১ পৃ. ভূমিকা

২. ঐ, *সমাজের বলি,* ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, মুদ্রণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত, পৃ. ৩

৩. ঐ, পৃ. ৮২

৪. ঐ, *সোনাই দীঘি,* ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, মুদ্রণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত, ভূমিকা

৫. ঐ, *কবি চন্দ্রাবতী,* ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত
৬. ঐ, *মহুয়া,* নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৫, পৃ. ৬
৭. ঐ, *অনেক রক্ত ছড়িয়ে,* নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৭৯ পৃ. ১২
৮. ভট্টাচার্য, প্রসাদকৃষ্ণ, *বেহেস্তের ফুল,* পাবলিশার্স ওনলি, কলকাতা, মুদ্রণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত, ভূমিকা।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্যান্য মাধ্যমে গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজনা করে 'মহুয়া' সিনেমা। পরিচালক- হীরেন বসু, কাহিনি/চিত্রনাট্য রচনা করেন মন্মথ রায়। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন- দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯৫২ সালে উদয়ন পিকচার্সের প্রযোজনা- 'কবি চন্দ্রাবতী'। পরিচালনা- হীরেন নাগ, কাহিনি সংকলন- আচার্য সুকুমার সেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন- অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, অসিত বরণ, রাজলক্ষ্মী। ১৯৫৮ সালে শ্যামাসুন্দর বাণী চিত্রম্ 'লীলাকঙ্ক'। পরিচালনা- সতীশ দাশগুপ্ত, কাহিনি- অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন- তাপসী রায়, পাহাড়ী সান্যাল। দেবীকা চিত্রমন্দিরের প্রযোজনায়- 'সোনাই দীঘি' ('দেওয়ান ভাবনা পালা' অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালা) চলচ্চিত্রায়িত করার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- অসীম ব্যানার্জী। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে- সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, নির্মলকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক। কিন্তু কাজটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হতে পারেনি।

নীরদ হাজরা *ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প* (জুলাই ১৫, ১৯৮৭) নামে 'বাংলা দেশের কিশোর-কিশোরীদের তুলে দেবার' লক্ষ্য রেখে অতি সংক্ষেপে গীতিকাগুলির গল্পরূপ দেন। সেখানে 'মহুয়াসুন্দরী বা নদ্যার চাঁদের কথা' নামে 'মহুয়া' গীতিকার কাহিনি রূপান্তরিত হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য *ভালবাসার গান* (অক্টোবর ১৯৯৩) নামক গ্রন্থে মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলির গল্প-রূপান্তর করেন। *ভালবাসার গান*-এ লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, নবরূপায়ণের বিষয়টি বিশেষভাবে দেখা যায়। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *মৈমনসিংহ গীতিকার কথামালা* (ফেব্রুয়ারি ২০১৩) গ্রন্থে যে পাঁচটি গীতিকার কাহিনিকে গল্পের রূপ দিয়েছেন। অমর মিত্রের *মোমেনশাহী উপাখ্যান* উপন্যাসটি দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০১৯। এটিকে গীতিকার কোনো একটি পালার কাহিনির আধুনিক রূপান্তর বলা যাবে না। এটিকে বলা যেতে পারে মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনিগুলির আলোকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গীতিকার সময় ও সেই-সময়কার সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা ও ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণ।

প্রমথনাথ বিশী 'মহুয়া' পালা অবলম্বনে *প্রাচীন গীতিকা হইতে* (১৩৪৪) গ্রন্থটি রচনা করেন। কবি নিজস্ব অনুভবে রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে গীতিকার আখ্যানটিকে সমিল ১৬

মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ বন্ধনে বেঁধেছেন। প্রমথনাথ বিশী 'মহুয়া' যার মধ্যে তাঁর কবিত্ব শক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলা প্রথম ব্যান্ড 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র জন্মদাতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় "'মহুয়া সুন্দরী' নামে একটা মিউজিক্যালও তৈরি করেছিল, যার জন্য প্রায় কুড়িটা গান কম্পোজ"[১] করেছিলেন। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সেটি।

নাটক, যাত্রায় রূপান্তরের সঙ্গে এজাতীয় রূপান্তরের বড়ো পার্থক্য হল মূলের পরিবর্তন খুবই কম চোখে পড়ে। গীতিকার মধ্যেকার ইঙ্গিত বা সম্ভাবনাকে অনেকে বিস্তৃতি দিয়েছেন। অনেকে আবার মূলের প্রায় কিছুই পরিবর্তন না করে একটি সাহিত্য সংরূপকে অন্য একটি মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন মাত্র।

উৎস নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চট্টোপাধ্যায়, মিনতি, "গৌতম একজন ভিশনারি", *সংবাদ প্রতিদিন রোববার*, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), 'মিউজিক ডে' বিশেষ সংখ্যা, ১৭ জুন ২০১৮, পৃ. ৬

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন মাধ্যমে গীতিকার রূপান্তর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় যখন *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালা কিংবা *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* পালাগুলি প্রকাশিত হয় তখন পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ এই বিভাজন হয়নি। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশে গীতিকার কাহিনির নাট্যরূপের যে-সকল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে নিচে তা তালিকা আকারে দেওয়া হল-

ক্রমিক সংখ্যা	**নাটককারের নাম**	**নাটকের নাম**	**প্রকাশ সাল**	**প্রকাশক**
১	আযীম উদ্‌দীন আহমদ	মহুয়া	১৯৫২	অজ্ঞাত
২	আযীম উদ্‌দীন আহমদ	কাঞ্চন	১৯৬২	অজ্ঞাত
৩	এম.এ. মজিদ	কবি চন্দ্রাবতী	১৯৭৯	অজ্ঞাত
৪	নাজমুল আহসান	মহুয়ার পালা	১৯৯২	অজ্ঞাত
৫	মনজুরুল হক মিলন	মহুয়া সুন্দরী	১৯৯৬	অজ্ঞাত
৬	জাহিদ রিপন	কাজল রেখা	১৯৯৭	অজ্ঞাত
৭	নাজমুল আহসান	কমলা সুন্দরী	২০০০	অজ্ঞাত
৮	আফসার আহমদ	চাঁদ ও চন্দ্রাবতী	২০০৭	ভাষাচিত্র
৯	সাইমন জাকারিয়া	মলুয়া সতীর আখ্যান	২০১৩	অ্যাডার্ন পাবলিকেশন
১০	সাইমন জাকারিয়া	ময়নামতীর জ্ঞান	২০১৩	অ্যাডার্ন পাবলিকেশন
১১	লিয়াকত আলি লাকি	সোনাই মাধব	২০১৬	বহুরূপী পত্রিকা, সংখ্যা- ১২৫

নাটক, যাত্রায় রূপান্তরের সঙ্গে এজাতীয় রূপান্তরের বড়ো পার্থক্য হল মূলের পরিবর্তন খুবই কম চোখে পড়ে। গীতিকার মধ্যেকার ইঙ্গিত বা সম্ভাবনাকে অনেকে বিস্তৃতি দিয়েছেন। অনেকে আবার মূলের প্রায় কিছুই পরিবর্তন না করে একটি সাহিত্য সংরূপকে অন্য একটি মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন মাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যবিভাগ, বিভিন্ন নাট্য দল, লোকনাট্য শিল্পী গীতিকার কাহিনির নাট্যরূপ দিয়ে পরিবেশন করেছেন ইউটিউবে মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার বিভিন্ন পালার নাম দিয়ে খুঁজলে বেরিয়ে আসবে এমন অসংখ্য তথ্য। কুদ্দুস বয়াতী, দিলু বয়াতীদের পালাগুলির কথা এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এবং এটি অনুমান করা বোধ হয় খুব অন্যায় হবে না ইউটিউব এবং ইন্টারনেটে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে সেগুলি অতি সামান্য। এর বাইরেও অসংখ্য তথ্য রয়েছে যেগুলি নেট মাধ্যমে আসেনি।

বাংলাদেশের যাত্রা মঞ্চেও গীতিকার কাহিনি উঠে এসেছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'চাঁদের মেয়ে' বাংলাদেশেই প্রথম অভিনীত হয়। কলকাতার গণেশ অপেরা, আর্য্য অপেরা, জয়ন্তী অপেরা থেকে একের পর এক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর 'অবশেষে বরিশালের নট্ট কোম্পানী বুক ঠুকিয়া ইহাকে গ্রহণ করিলেন।' 'চাঁদের মেয়ে' বাংলা যাত্রা জগতে গীতিকার কাহিনির প্রবেশের সুবিস্তৃত পথ কাটলো, তারপরে পুরোটাই ইতিহাস। আসিরুদ্দিন আহমদের ঈশা খাঁ, জসীমউদ্দিন আহমেদের 'কাজল-রেখা', পরিতোষ ব্রহ্মচারীর 'মহুয়া', এমএ মজিদের 'কমলা সুন্দরী', 'বেদের মেয়ে মহুয়া'; রাখাল বিশ্বাসের 'মহুয়া', কাজী আবুল হোসেনের 'আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী', কালীপদ দাসের 'কমলা সুন্দরী' ইত্যাদি যাত্রাপালার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৬৬ সালে বাংলাদেশের পরিচালক আলি মনসুর নির্মাণ করেছিলেন 'মহুয়া' সিনেমা। পরে ১৯৮৬ সালে শামসুদ্দিন টগর 'মহুয়া সুন্দরী' সিনেমা বানান। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার ও মাস্টার অপেরার যৌথ অর্থায়নে নির্মিত জয় 'মহুয়া সুন্দরী' সিনেমা। কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা রওশন আরা নীপা। ২০০৬ সালে নেত্রকোণায় 'মহুয়া সুন্দরী' যাত্রাপালা দেখে 'মহুয়া সুন্দরী' তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তিনি। যাত্রার নারী শিল্পীদের জীবন যন্ত্রণাকে মহুয়ার জীবনের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিনোদিনী দাসীর জীবন ইতিহাসকে গল্পের ছলে শোনানো হয়, বিনোদিনীর ছবিকে রাখা হয়েছে নায়িকা ছবির ঘরে। সেটাই যেন বলে দিচ্ছে নারী শিল্পীদের জীবন অতীত থেকে বর্তমানে সমাজের কাছে কোন খানে। যে নারী রাতের অন্ধকারে সকলের কামনার বস্তু, দিনের আলোকে সে অস্পৃশ্যা। 'চর্যাপদ'-এর সময় থেকে এই বিষয়টি আমরা দেখে আসছি। নারীর

শরীর নয়, তাঁর মন আসল এই সিনেমায় সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যাত্রায় মহুয়া চরিত্রে অভিনয় করা ছবির জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে একাকার হয়ে যায় গীতিকার মহুয়ার জীবন। আজকের নদের চাঁদ গ্রামের ধনীর বিদেশ থেকে পাশ করা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করা পুত্র। ছবির শিল্পী সত্ত্বাকে শ্রদ্ধা করতে করতে ছবিকে ভালবেসে ফেলে। এমনকি পিতার বৈভব সমস্ত কিছু ত্যাগ করল ছবির জন্য।

পার্থিব টেলিফিল্মস 'মহুয়া সুন্দরী' নামে টেলি ফিলম বানিয়েছিল। নাট্যরূপ জালাল উদ্দিন চৌধুরী, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও পরিচালনা- পার্থিব মামুন। আবৃত্তি একাডেমির ৩৪-তম প্রযোজনা ছিল মহুয়া পালার শ্রুতিরূপ- 'পুঁথি-গীতে মহুয়া'। প্রয়োগ পরিকল্পনা ও ভাবনা মসুদ আহমেদ। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা এম. আর. রুবেল। বাউল মেয়র গানের আকারে- 'মহুয়া সুন্দরী নদের চাঁদ' নামে 'মহুয়া' পালার নবরূপায়ণ করেছিলেন। লোকগাথা ভিত্তিক অনুষ্ঠান 'মহুয়া সুন্দরী' এই নামে 'কাহিনি কিংবদন্তি' সিরিজে বাংলাদেশে সিরিয়াল হয়েছে। যার টিভি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন আহমেদ ফখরুদ্দিন। নির্দেশনা মনজুর রহমান। কৃষ্ণা মিউজিক 'Folk Dance Drama Audio', 'মহুয়া সুন্দরী' নামে 'মহুয়া' পালার একটি ক্যাসেড প্রকাশ করেছিল।

প্রথম আলো পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে ২৩ অক্টোবর ২০১৬, সময়- সন্ধ্যা ৮-২৪ মিনিটে প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায় 'বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে থাকবে' নাচের দল নৃত্যাঞ্চলের নৃত্যনাট্য 'মহুয়া'। পরিচালনায়- শামীম আরা নীপার। শিবলী ও নীপা ছাড়াও এই নৃত্যে অংশ নেন নৃত্যাঞ্চলের আরও ৩০ জন নৃত্যশিল্পী। এই নৃত্যনাট্যের আধুনিকতা বিষয়ে প্রতিবেদনে লেখা হয়- 'এই মঞ্চায়নে নাটকের অংশগুলোর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন থাকবে। শিবলী মহম্মদ বলেন, 'নাট্যোৎসবে মঞ্চায়ন হচ্ছে বলে নাটকের জায়গাগুলো আরও একটু বাস্তব করে তোলার চেষ্টা করেছি। পোশাকগুলোর আনা হয়েছে আধুনিকতা।'

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ২৪/১২/২০১৭ এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় শিল্পকলা একাডেমিতে ময়মনসিংহের বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে নৃত্যনাট্য 'মহুয়ার পালা'। *সমকাল পত্রিকার* ২৭ এপ্রিল ২০১৭ সালে 'নন্দন প্রতিবেদক' অংশে যে খবর ছাপা হয়েছিল তা থেকে জানা যায়- বিশ্ব নৃত্য দিবস ও নৃত্যলোকের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২১ ও ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে নৃত্যলোকের সদস্যরা মঞ্চস্থ করে নৃত্যনাট্য 'মহুয়া'। এটির নির্দেশনায় ছিলেন- কবিরুল ইসলাম রতন। নদের চাঁদ চরিত্রে তিনি নিজে অভিনয় করেন। পালাটির নামভূমিকায় ছিলেন নৃত্যাভিনেত্রী সাদিয়া ইসলাম মৌ।

লোকায়ত বাংলায় অভিনীত হয় লোক কাহিনিভিত্তিক নাটক 'মলুয়া পালা'। নাট্যরূপ- আহমেদ ফখরুদ্দিন। নির্দেশনা- নূর হোসেন দিলু। কবি আবদুর রশিদ খান সনেটের আঙ্গিকে মহুয়া পালার একটি নবরূপ দিয়েছিলেন। স্বকৃত নোমানের, *ছোটদের পূর্ববঙ্গ গীতিকার গল্প* গ্রন্থের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে (এখানে মূলত পশ্চিমবঙ্গকে ধরতে হবে) গীতিকার কাহিনির আধুনিক রূপান্তরের সঙ্গে বাংলাদেশে গীতিকার কাহিনির আধুনিক রূপান্তরের বিশেষ করে নাটক, যাত্রার আধুনিক রূপান্তরের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে গীতিকার কাহিনির নাটক ও যাত্রায় আধুনিক রূপান্তর ঘটেছে এমন টেক্সট যে কটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে মনে হয়েছে কোথাও মূলের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখা হয়েছে। শিল্পীরা কোথাও বর্তমান সময়ের সঙ্গে ঐতিহ্যের সেতু বন্ধন রচনার চেষ্টা করছেন এই-সকল রচনার মধ্য দিয়ে। বর্তমান সময়ের সুর ও সংকট যে গীতিকার আখ্যানের আড়ালে উঠে আসছে না এমন কিন্তু নয়। তবু কোথাও গীতিকার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইঙ্গিতকেই যেন শিল্পীরা কাজে লাগাচ্ছেন। আবার গীতিকার আখ্যানবস্তুকে অবলম্বন করে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষারও খামতি নেই। তবু সেই পরীক্ষায় নেই বাজারি চমক। বরং রয়েছে স্রষ্টার সংযম ও শিল্পী মনের পরিচয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে গীতিকার কাহিনি যেভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, ভারতের ক্ষেত্রে সেভাবে নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এখনও গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবন বজায় রয়েছে। গ্রামীণ মানুষ তো বটেই, লোকঐতিহ্যের সঙ্গে সে দেশের নাগরিক মানুষেরও যথেষ্ট গভীর সংযোগ রয়েছে। মাটি ছাড়লেও শিকড়ের টান সে দেশের মানুষ খুব একটা ছাড়েননি। এর পিছনে একটি ঐতিহাসিক কারণও বুঝি রয়েছে। বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ সে দেশের মানুষ যেভাবে করছেন তাতে মনে হয় একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গীতিকার রূপান্তরের সম্ভাব্য কারণ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপান্তর অত্যন্ত পরিচিত ও খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। কোনো আখ্যান, চরিত্র বা টেক্সটকে কেন পরবর্তী কাল আধুনিক রূপান্তর ঘটায় তার পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে। নাটক ও যাত্রার মধ্য দিয়ে গীতিকার কাহিনির আধুনিক রূপান্তরের পিছনে সম্ভাব্য যে কারণগুলি কাজ করেছে বলে মনে হয় সেগুলি হল-

১। লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র রচনার চেষ্টা।

২। গীতিকার আখ্যানের মধ্য দিয়ে নিজ ভাবনা ও বক্তব্যকে প্রকাশ। বর্তমান সময়ের সুর ও সংকটকে গীতিকার আখ্যানের আলোকে তুলে ধরা।

৩। গীতিকার মধ্যেকার ইঙ্গিত ও সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন শিল্প সৃষ্টি।

৪। গীতিকার অভিনয় রীতির যে আঙ্গিক সেটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি ফর্ম। এই লোক উপস্থাপন রীতিকে অনুসরণ করার ইচ্ছা থেকেও গীতিকার আধুনিক রূপান্তর হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে নাটকের ক্ষেত্রেই একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যাত্রার ক্ষেত্রে একথা একেবারেই খাটে না। কারণ সেখানে সংলাপ ও বহু চরিত্রের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র কাহিনিকে তুলে ধরা হয়।

৫। মঞ্চে লোকজীবন, লোকসংস্কৃতির উপাদানকে এনে গতানুগতিক বিষয় থেকে দর্শককে ভিন্ন সাধ দেওয়া। বিশেষ করে গান, নাচ, বাজনার ব্যবহার দর্শককে মোহিত করে। নাগরিক জটিলতা, 'এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার'-এর সূক্ষ্ম রসায়নে ডুব না দিয়ে গীতিকার সহজ-সরল অভিরাজ্যে বিচরণে দুদণ্ড শান্তির খোঁজ পায় দর্শক।

৬। নির্দেশক যে ধরনের নাটক মঞ্চায়নের জন্য চাইছেন তিনি পাচ্ছেন না, উচ্চ মেধাসম্পন্ন নাটককার জন্মাচ্ছেন না বা যারা লিখছেন তাদের রচনায় পরিচালক বা দলের লোকজন খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের অন্তরের চাহিদা ও ভাষাকে। তখন গীতিকার কোনো আখ্যানের মধ্যে হয়ত নির্দেশক দেখতে পাচ্ছেন সেই নাট্য উপাদানকে, যেটি হয়ত তিনি খুঁজছিলেন কিংবা তাঁর মনে হল এই অংশটিকে মঞ্চে আনা যায়। তখন তিনি কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে সেটির মঞ্চ উপযোগী একটি পাঠ দিয়ে নিলেন (নাট্যরূপ)। কিংবা কোনো

নাটককার তাঁর আগ্রহ থেকেও গীতিকার কাহিনির নাট্যরূপ কিংবা যাত্রার রূপ দিতে পারেন।

৭। অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাব থেকেও এই ধরনের সন্ধান চলতে পারে। যে কারণে নাটক যাত্রা উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা কবিতার কাছে যায় তার আখ্যান সংগ্রহের জন্য।

৮। গীতিকার ভাষা এবং তার উপস্থাপন রীতি দর্শক আকর্ষণে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেদিকে তাকিয়ে নাটক, যাত্রা কিংবা যেকোনো শিল্পের যদি অন্যতম লক্ষ্য হয় মানুষের কাছে পৌঁছানো তাহলে এই বিষয়টিও দলের নির্দেশক ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কাজ করে তা বলা যেতেই পারে। নাগরিক মঞ্চে আঞ্চলিক ভাষার উপস্থাপনা নতুন স্বাদ দেয় বোইকি! নাটক, যাত্রা, সিনেমায় আজও কৌতুক সৃষ্টির জন্য দু-একটি চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার করা হয়। দর্শকও সেটিকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন।

৯। গীতিকার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা থেকেও রূপান্তর করা হয়েছে গীতিকাকে। গীতিকা আবিষ্কারের পরপর যে রূপান্তরগুলি হয়েছিল তার পিছনে এই কারণটি বিশেষভাবে কাজ করেছিল। সময় যত এগিয়েছে তত হয়ত রূপান্তরের পিছনে এই কারণটি গুরুত্ব হারিয়েছে।

১০। লোকসাহিত্যের মধ্যে জনপ্রিয়তার নানা উপাদান সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেজন্যেই যুগ যুগ ধরে তা মানুষের আনন্দের কারণ হয়ে উঠতে পারছে। বিভাস চক্রবর্তী থেকে যারাই গীতিকা থেকে তাদের নাটকের উপাদান বেছে নিয়েছিলেন তারা এই বিষয়টি ভেবে ছিলেন বলে মনে হয়। তাছাড়াও গীতিকার কাহিনির মধ্যে একধরনের নমনীয়তা রয়েছে। এগুলিকে যে কোনো সময়ে যেকোনো কালের বিষয় করে মঞ্চে আনা যায়। দর্শকেরাও সহজে এই-সকল বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্তও করতে পারেন। যেকোনো কালের মানুষের অনুভূতিকে প্রকাশের চিরন্তন ক্ষমতা রয়েছে গীতিকার কাহিনির। মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও নেওয়া যায় প্রভূত স্বাধীনতা। এবং একথা সততার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় একটি সহজ-সরল কাহিনি যত সহজে পাঠক বা দর্শকের হৃদয় জয় করতে পারে একটি গুরুগম্ভীর রচনা সেটি পারে না। খুব কমজনই তলিয়ে ভাবেন, মাথা ঘামান সাহিত্য-শিল্পের অর্থ বোঝার জন্য। বেশিরভাগ মানুষের কাছে নিছক বিনোদনই লক্ষ্য থাকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে গীতিকার কাহিনি বোঝার জন্য মানুষকে খুব বেশি মস্তিষ্ক চালনা করতে হয় না। সহজ-সরল ভাষায়, নির্জটিল ভঙ্গিতে যেভাবে একটি কাহিনিকে গীতিকাগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে তা পাঠক বা দর্শককে সহজেই আকর্ষণ করে। সেটিও একটি কারণ হতে পারে গীতিকার আধুনিক রূপান্তরের।

১১। তাছাড়া নাগরিক মানুষের অনেকেই মাটি ছেড়েছে দীর্ঘদিন। তবু মনের তলে জেগে আছে গ্রাম। এই সূত্রে একটি প্রযোজনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে দু-চার কথা বলা যাক। ২০১৭-র ৮ অক্টোবর ঢাকুরিয়ার অবন মহলে 'ময়মনসিংহ প্রাক্তনী'দের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'কঙ্কলীলা' নৃত্যনাট্য পরিবেশনের কথা। যারা এই নৃত্যনাট্য পরিবেশন করছেন তাদের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যোগ ক্ষীণ, এমনকি যারা দর্শক তাদের সঙ্গেও। তাহলে কেন এই উপস্থাপন? দীর্ঘ সময় পেরিয়েও কেন গীতিকার কাছে ফিরে যাওয়া ?

বৃহত্তর কলকাতার বুকে 'ময়মনসিংহ প্রাক্তনী' নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক দশক। দেশভাগের পর যাদবপুর বা তার সন্নিহিত রেল লাইনের পাশে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ভূমিহারা মানুষেরা এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে এই অঞ্চলে তাদের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘ। আজও এখানকার বিভিন্ন পল্লীর নামের মধ্যে মিলবে উদ্বাস্তু, জবর দখল, পুনর্বাসন-এর স্মৃতি— 'বিজয়গড়', 'আজাদগড়', 'শহীদনগর', 'নবনগর', 'শক্তিগড়', 'প্রতাপগড়', 'কারজু নগর', 'অশ্বিনী নগর'...। পূর্ববঙ্গ থেকে এই অঞ্চলে আসা প্রতিটা পরিবার যে ময়মনসিংহের তা কিন্তু নয়। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে বাপ-ঠাকুরদা বহুদিন আগে মাটি ছেড়ে এলেও মাটির টান সেদেশ থেকে আসা যারা এখনও জীবিত তারা ভুলতে পারেননি। পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্ম যাদের জন্ম এখানে, যারা পুরোপুরি নাগরিক, শহরের স্কুল-কলেজে পড়া, এখানকার আদবকায়দায় মোড়া, যারা ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরকে হয়ত দেখেছে ছবিতে কিংবা বাপ-ঠাকুরদার মুখ থেকে গল্প শুনে মনে মনে সেদেশের এক মূর্তি কল্পনা করে নিয়েছে, সেদেশের জলবায়ু, সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোই যোগ নেই তারাও এক অজানা টান অনুভব করছেন সেই দেশের প্রতি, সে দেশের সংস্কৃতির প্রতি।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ঘটনা খুব বেশি। কারণ সে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে গীতিকার সম্পর্ক। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঐতিহ্যের সঙ্গে গীতিকার যোগ বাঙালি হওয়ার সূত্রে প্রাপ্ত, রক্তের টান কতখানি সেটি একটি প্রশ্ন চিহ্ন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দুই বঙ্গ অভিন্ন থাকলেও ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা সমগ্র ভারতের রাজধানী থাকায় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্রিটিশ অনুকরণ, তাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ কিংবা ইংরেজদের সংস্কৃতির স্পর্শে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতির পরিবর্তন যতখানি হয়েছিল প্রান্তিকতার জন্য পূর্ববঙ্গে ততখানি হয়নি। আর সংস্কৃতি প্রসারণের গতি সর্বদা কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে, ফলে ১৯৪৭-এর পর ঢাকা ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গুরুত্ব পেতে থাকে ১৯৭২-এ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তা সমগ্র দেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যের সঙ্গে দূরত্ব কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের বহুদিন আগেই রচিত হলেও বাংলাদেশে তা কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে নগরে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতি টান এখনও যথেষ্ট। সেদেশের নাগরিক মঞ্চগুলিতে আজও লোকউপাদান, তার মধ্যে গীতিকাও রয়েছে বারবার ঘুরে ফিরে উঠে আসার পিছনে এটি অন্যতম কারণ। তাছাড়াও ব্রিটিশদের অনুকরণে আমরা যে প্রসেনিয়াম থিয়েটার গড়ে তুলেছিলাম তার চর্চা, তার বিকাশ মূলত হয়েছে কলকাতায়। আর একথাও মনে হয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে কটি বিষয়কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে বাংলাদেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তার মধ্যে সে দেশের লোকসংস্কৃতি অন্যতম।

সপ্তম অধ্যায়

গীতিকার রূপান্তরের মূলগত ভিত্তি ও রাজনীতি

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে নাটক ও যাত্রায় রূপান্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি খেয়াল করলেই রূপান্তরের ভিতরকার মূলগত ভিত্তি ও রাজনীতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। নাগরিক সংস্কৃতি আসলে লোক-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিজস্ব শর্তে। কখনও গীতিকার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাকে মঞ্চে আনার চেষ্টা করা হয়েছে, কখনও তাকে একটি অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করে স্বাধীন গল্প বলে চমক সৃষ্টি করে দর্শক মাতানো হয়েছে। উৎসের প্রতি সামান্য ঋণটুকুও স্বীকার না করে- 'কাল্পনিক নাটক', 'ঐতিহাসিক নাটক' যাত্রাকে এমন চিহ্নায়ন ছিল খুবই স্বাভাবিক। দু-একটি আঞ্চলিক শব্দ (পূর্ববঙ্গীয় বঙ্গালী ভাষার অনুকরণে) বললেই যে সেটি লোকসংস্কৃতি হয়ে ওঠে না তারজন্য আঞ্চলিক ভাষার চলন, বলন ভঙ্গি, টানকে রপ্ত করতে হয় সেটি অধিকাংশ নির্দেশক বুঝতে পারেননি, দলের কুশীলবরাও আয়ত্ত করতে পারেননি। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক এবং জনপ্রিয় গীতিকাগুলি রূপান্তরের প্রতি আগ্রহের বিষয়টিও এক্ষেত্রে দৃষ্টি এড়ায় না। কলকাতার যাত্রাদলের তথা কথিত 'হিট' যাত্রাপালার কপালে জুটছে মুদ্রণ সৌভাগ্য। যাত্রাপালা গ্রন্থের শিরোনাম পৃষ্ঠায় ফলাও করে লেখা থাকছে তা। যাত্রাপালা রূপ নিচ্ছে 'থিয়েট্রিক্যাল' যাত্রায়। প্রি-সবমিশনের কারণে গীতিকার কাহিনি আশ্রয়ী নাটক ও যাত্রাগুলির ভিতরকার আধুনিকতার চিহ্নগুলিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্রাকারে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যেই রূপান্তরের মূলগত ভিত্তি ও রাজনীতি লুকিয়ে রয়েছে। ওই আলোচনার অনেকখানি গবেষণা পত্রের চূড়ান্ত কপি জমার সময়ে এই অধ্যায়ে চলে আসবে। এই অধ্যায়ের আলোচনা তাই বিস্তৃত করা সম্ভব হল না।

অষ্টম অধ্যায়

গীতিকার রূপান্তর : সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা

গীতিকার আবিষ্কারের পর জনপ্রিয় হওয়া, মানুষের চর্চা আলোচনা যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে গীতিকার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই। আবিষ্কারের পর পর মঞ্চে গীতিকার কাহিনি আসার কারণটি সেটাই। গত শতাব্দীর তিন-চারের দশকের কথা ছেড়ে দিলে বিভাস চক্রবর্তীর 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'-র পরবর্তী ইতিহাস খেয়াল করলেই বোঝা যাবে 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'-র সাফল্য কীভাবে এদেশের অন্য নাট্য দলগুলিকে অনুপ্রাণিত করছে গীতিকার কাহিনিকে মঞ্চে আনতে। মনীশ মিত্র যখন চন্দ্রাবতীকে মঞ্চে আনেন তখন বিশেষ ঋণ স্বীকার করেন বিভাস চক্রবর্তীর কাছে। ৫ জুন, ২০১৭, সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় একাডেমি মঞ্চে নয় নাটুয়ার 'মৈমনসিংহ গীতিকা' দেখতে উপস্থিত ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। অভিনয় শেষে গৌতম হালদার এই জাতীয় নাটক মঞ্চে আনার ক্ষেত্রে বিভাস চক্রবর্তীই যে 'পথ প্রদর্শক' সে কথা সর্ব-সমক্ষে বিনম্র চিত্তে স্বীকার করে ছিলেন।

'সোনাই দীঘি' যাত্রার পর সোনাই দীঘি শাড়ি বেরিয়েছিল। জ্যোৎস্না দত্ত তখন একটা ব্র্যান্ড। ভাবনা কাজীর ভূমিকায় অভিনয় করে দিলীপ কুমার ভিলেন হিসেবে এত বিখ্যাত হয়েছিলেন যে গ্রামে বাচ্চারা ঘুম পড়তে না চাইলে মারা বলতেন চুপ করে ঘুমাও নাহলে 'ভাবনা কাজি চলে আসবে'। 'সোনাই দীঘি' যাত্রাপালার জনপ্রিয়তায় ওই নামে সিনেমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রকুমার দে নিজেই 'সোনাই দীঘির পরে' নাটক লিখছেন। যে যাত্রাপালার ভূমিকায় তিনি নিজেই জানাচ্ছেন:

> সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত আমার "সোনাই দীঘি" নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে কিছুসংখ্যক প্রকাশক ও নাট্যরসিক আমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন এর উত্তরকাণ্ড লিখবার জন্য। সোনাই দীঘিতে সোনাই বিষপানে আত্মহত্যা করলে নবাব হোসেন শাহের বিচারে ভাবনা কাজী প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো। তার পরের ঘটনা এই সোনাই দীঘির পরে।[১]

নলিনী বেরা তাঁর *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা* উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন 'সোনাই দীঘি' যাত্রাপালা অভিনয়ের কথা।

কবি জসীম উদ্দীন গীতিকার কাহিনির অনুকরণে লিখছনে- *পদ্মপারে, বেদের মেয়ে*। *বেদের মেয়ে* অবলম্বনে নারকেল ডাঙ্গা নর্থ পাঞ্চালী নাট্যদল অভিনয় করছে- 'বাইদানি'। দেওয়ান মদিনা পালার রচয়িতা মনসুর বয়াতির জীবন নিয়ে শামসুল হকের উপন্যাস *বুকঝিম এক ভালবাসা* অবলম্বনে 'বুকঝিম এক ভালবাসা' (নির্দেশনা ও অভিনয়- শ্রমণ চট্টোপাধ্যায়, একুশ শতক প্রযোজনা) বর্তমান সময়ে মঞ্চে সাড়া জাগায়। যে-গুলি গীতিকার কাহিনির সরাসরি আধুনিক রূপান্তর না হলেও গীতিকার কাহিনি ও উপস্থাপন রীতির প্রভাবজাত। আর একটি তথ্য কাকতালীয় হলেও এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মহুয়া* কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এ।

উৎস নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *সোনাই দীঘির পরে*, ভৈরব পুস্তকালয়, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত, ভূমিকা

উপসংহার

পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে, এগিয়ে চলে। নাগরিক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি দেওয়া-নেওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলে। ফলে গীতিকার আখ্যানের আধুনিক রূপান্তর আসলে সংস্কৃতি বিস্তারেরই অঙ্গ। আর একথাতো স্বীকার করতেই হবে পাঠক বা দর্শক যে রচনার মধ্যে তার সময়, চারপাশকে দেখতে পায় সেই রচনাকেই তারা সমাদরে গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে লেখক তার সময়কে পূর্বের রচনার আলোকে তুলে ধরবেন এটি খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। তবে আধুনিকতার মাত্রাকে কতখানি চড়াতে হবে এটি হয়ত অনেক শিল্পী বুঝতে পারেননি। তবে নগর ও গ্রামের মধ্যে অলিখিত এক দ্বন্দ্ব রয়েছে। গ্রাম উচ্চাভিলাসে তার কল্পনার স্বপ্নপুরী নগরকে জয়ের অদম্য নেশায় ছুটে যায়। গোলক ধাঁধার জগতে অনেকেই হারিয়ে বসে নিজেকে এবং নিজের আত্মাকে। অন্যদিকে নগর ছদ্ম রোমান্টিকের দৃষ্টি থেকে ক্লান্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে গ্রামে। ক্লান্তি থেকে বিশ্রামে, নগর থেকে পল্লীতে ফিরে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের সুখ আছে। তেমনি কী আনন্দ আজকের নাগরিক খুঁজে নিতে চাইছে লোকসংস্কৃতির মধ্যে? গীতিকার আধুনিক রূপান্তর এই ভাবনারই ফসল বলে মনে হয়।

গ্র ন্থ্ প ঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. আহমদ, আফসার, 'চাঁদ ও চন্দ্রাবতী', *নাটক সংগ্রহ,* ভাষাচিত্র, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১২

২. চক্রবর্তী, বিভাস, *মাধব মালঞ্চী কইন্যা প্রস্তুতি ও নির্মাণ,* সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১, পৃ. ২১

৩. জাকারিয়া, সাইমন, 'ময়নামতীর জ্ঞান', 'মলুয়া সতীর আখ্যান', *নাটক সংগ্রহ-২,* অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৩

৪. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *অনেক রক্ত ছড়িয়ে,* নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৭৯

৫. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *কবি চন্দ্রাবতী,* ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত

৬. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *গাঁয়ের মেয়ে* বা *রূপবতী,* ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, দশাহরা, ১৩৬১

৭. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *চাঁদের মেয়ে,* ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৬১

৮. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *ঝড়ের দোলা,* শ্রীমা বুক সিণ্ডিকেট, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৬

৯. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *ভাগ্যের বলি,* নির্মল-সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭২

১০. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *মহুয়া,* নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৫

১১. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *লোহার জাল,* নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩

১২. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *সতীর ঘাট* , ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, শুভ রথযাত্রা, ১৩৭০

১৩. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *সমাজের বলি,* ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত

১৪. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, *সোনাই দীঘি*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত
১৫. নোমান, স্বকৃত, *ছোটদের পূর্ববঙ্গ গীতিকার গল্প*, রোদেলা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১৮
১৬. প্রামাণিক, অশোক (সম্পাদিত), *দস্যু কেনারামের পালা*, শ্যামবাজার ব্লাইণ্ড অপেরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০২১
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *মৈমনসিংহ গীতিকার কথামালা*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
১৮. ভট্টাচার্য, প্রসাদকৃষ্ণ, *বেহেস্তের ফুল*, পাবলিশার্স ওনলি, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত
১৯. ভট্টাচার্য, প্রসাদকৃষ্ণ, *মহব্বতের ইনাম*, পাবলিশার্স ওনলি, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত
২০. ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ, ভালবাসার গান, অন্বিষ্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বীরাষ্টমী কার্তিক ১৪০০/অক্টোবর, ১৯৯৩
২১. ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার, 'কাজলরেখা', *ক্লিওপাট্রা ও অন্যান্য নাটক*, পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৫
২২. রায়, মন্মথ, 'মহুয়া', *নাট্য গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, মনমথন প্রকাশন, কলকাতা, ১৫ই আগস্ট, ১৯৮৫
২৩. সেন, সুশীলকুমার, *মহুয়া*, কল্পতরু সারস্বত পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯২৫
২৪. হাজরা, নীরদ, *ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ৩০, ১৪২৩, জুলাই ১৫, ২০১৬

মৌলিক গ্রন্থ

১. অর্ক, ইউসুফ হাসান, *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য 'পালাগান' আঙ্গিক বিচার ও 'বর্ণনাকারীর অবস্থান' অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪২৫; এপ্রিল ২০১৮

২. আইয়োব, আলী আহাম্মদ খান, *গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, মে ২০১১
৩. আল্‌দীন, শামস্, *লোকসাহিত্যে নারী*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৪. আহমদ, আফসর, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১৫; জুন ২০০৮
৫. আহমদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধাবলি, গতিধারা*, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১২; আগস্ট ২০০৫
৬. ইকবাল, শহীদ, *বাংলাদেশের নাটকের রূপরেখা*, গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪২১/সেপ্টেম্বর ২০১৪
৭. ইসলাম, আহমেদ আমিনুল, *ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী নাট্য : গঠন ও পরিবেশনারীতি* , বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথমপ্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/মে ২০১০
৮. ইসলাম, নজরুল, *আলেয়া ও ঝিলিমিলি*, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, পৌষ ১৩৬৮
৯. ইসলাম, নজরুল, *মধুমালা*, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২
১০. ইসলাম, মযহারুল, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫
১১. করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০--১৮৫৭]*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, আগস্ট ২০১২
১২. করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল- দ্বিতীয় খণ্ড*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৭
১৩. কায়সার, শান্তনু, *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮
১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাট্য-প্রসঙ্গ ও নাট্যোপাদান*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বড়দিন ২০০৬
১৫. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২১; সেপ্টেম্বর ২০১৪
১৬. ঘোষ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ, *সোনার দাগ (শতবর্ষের আলোয় বাংলা চলচ্চিত্র)* , যোগমায়া প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০

১৭. ঘোষ, বারিদবরণ, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস,* শ্রী পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১

১৮. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুন ২০১৫

১৯. চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন, *মৈমনসিংহ গীতিকা পুনর্বিচার,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০৪

২০. চৌধুরী, আবুল হাসান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে প্রেমচেতনা,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৭; ফেব্রুয়ারি ২০০১

২১. জলী, হোসনে আরা, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা (১৯৪৭-১৯৮২),* অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

২২. জসীম উদ্‌দীন, *বেদেরমেয়ে,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, ২১শে বইমেলা-২০১৯

২৩. জাকারিয়া, সাইমন, *প্রণমহি বঙ্গমাতা,* উত্তরণ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪১০; ফেব্রুয়ারি ২০০৪

২৪. জাকারিয়া, সাইমন, বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৫; এপ্রিল ২০০৮

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকথা (সংকলন ও সম্পাদনা : রথীন চক্রবর্তী), নাট্যচিন্তা, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০২

২৬. তরু, মাযহারুল ইসলাম, *গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্য,* শোভা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুলাই ২০১৫

২৭. দাশ, শিশিরকুমার (সংকলন ও সম্পাদনা), সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, মে ২০১৬

২৮. দাস, প্রভাতকুমার, *যাত্রা-থিয়েটার ও অভিযাত্রা,* কালিন্দী ব্রাত্যজন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৬

২৯. দাস, প্রভাতকুমার, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা,* কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৩০. দে, তরুণকুমার, *প্রসঙ্গ : ব্রজেনকুমার দে [প্রথম খণ্ড],* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪২৩/ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৩১. দে, ব্রজেনকুমার, *বাংলার যাত্রা নাটক,* দিশারি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪১৭; জানুয়ারি ২০১১

৩২. দে, ব্রজেনকুমার, *সোনাই দীঘির পরে,* ভৈরব পুস্তকালয়, কলকাতা, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত

৩৩. দেব, চিত্তরঞ্জন, *বাংলার পল্লীগীতিকা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

৩৪. দীন, সেলিম আল, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০৩; জুন ১৯৯৬

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব),* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, *বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা দ্বিতীয় (করুণা) সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১২

৩৭. বাৎস্যায়ন, কপিলা, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য-* নারায়ণ চৌধুরী (অনুবাদ), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট্, নয়া দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

৩৮. বাগচী, তপন, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪/ জুন ২০০৭

৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *মৈমনসিংহ গীতিকার কথামালা,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৪০. বিশ্বাস, সুকুমার, *বাংলাদেশর নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০৪/মার্চ ১৯৯৮

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, *বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ অখণ্ড সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪, জানুয়ারি ২০০৮

৪২. বেগম, শিল্পী ও ড. আহাম্মদ আবদুল মনসুর, *গ্রামীণ জীবনে লোকসংস্কৃতি ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সহাবস্থান,* পুথিনিলয়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৪৩. ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২২ শে শ্রাবণ ১৪০৭

৪৪. মজুমদার, শ্রীরমেশচন্দ্র, *বাংলা দেশের ইতিহাস-দ্বিতীয়খণ্ড [মধ্যযুগ],* দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০২১

৪৫. মিত্র, অমর, *মোমেনশাহী উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪২৬/ ডিসেম্বর ২০১৯

৪৬. মিত্র, অজন্তা, *বাংলা গীতিকার রূপতাত্ত্বিক ও গঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯

৪৭. মোস্তাফা, এম. এ. মাসউদ, *ময়মনসিংহ অঞ্চলের কোচ আদিবাসী : জীবন ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৭/মে ২০১০

৪৮. মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের থিয়েটার ও নাটক, সময়*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৭

৪৯. মুখোপাধ্যায়, দেবযানী, *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাংলা যাত্রা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কবিপক্ষ, ১৪১৩

৫০. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় রত্নাবলী সংস্করণ, মাঘ১৪১৬/ফেব্রুয়ারি২০১০

৫১. রহিম, এম. এ., *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস [১৫৭৬-১৭৫৭] দ্বিতীয় খণ্ড* [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলের রাব্বি (অনুবাদ)], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৮/জানুয়ারি ২০১২

৫২. রায়, আনন্দনাথ, *বারভুঁইয়া বা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, নবযুগ সংস্করণ, পৌষ ১৪২৬/জানুয়ারি ২০২০

৫৩. রায়, বিশ্বনাথ, *পাঠক রবীন্দ্রনাথ*, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১

৫৪. রায়, শেখর, *সাহিত্য অন্বেষা*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৭

৫৫. লিপন, সাইদুর রহমন, *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/ মে ২০১০

৫৬. শহীদুল্লাহ, মহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭

৫৭. শাহরিয়ার, শিহাব, *বাংলাদেশের কোচ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

৫৮. সরকার, পবিত্র, *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড দে'জ সংস্করণ, মার্চ ২০০৮, ফাল্গুন ১৪১৪।

৫৯. সিদ্দিকী, আশরাফ, *লোক-সাহিত্য- দ্বিতীয় খণ্ড*, গতিধারা, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৪০৭; সেপ্টেম্বর ২০০০

৬০. সেন, গোপীনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে*, ভারতীয় লোকযান গ্রন্থমালা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৪

৬১. সেন, দীনেশচন্দ্র, *আশুতোষ-স্মৃতিকথা* (পরিচায়িকা ও সংকলন- নিমাইচন্দ্র পাল)। বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র শোভিত সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র, ২০১৪

৬২. সেন, দীনেশচন্দ্র, *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান,* বাতিঘর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৫; মার্চ ২০১৯

৬৩. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খণ্ড),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০৫; মার্চ ১৯৯৯

৬৪. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

৬৫. হক, সৈয়দ আজিজুল, ময়মনসিংহের গীতিকা জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য , অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩

৬৬. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশের লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১৯

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. করিম, আবদুল (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী- দ্বিতীয় খণ্ড,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫ মে ১৯৯৩

২. খাতুন, শাহিদা (সম্পাদিত), *একুশের প্রবন্ধ : ফোকলোর,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪১৩/ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

৩. খাতুন, শাহিদা (সম্পাদিত), *ফোকলোর সংগ্রহমালা-৯* (পালাগান : খুলনা অঞ্চল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১৭/জুন ২০১০

৪. খাতুন, শাহিদা (সম্পাদিত), *ফোকলোর সংগ্রহমালা-২১* (পালাগান : ময়মনসিংহ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১৭/জুন ২০১০

৫. খাতুন, শাহিদা (সম্পাদিত), *ফোকলোর সংগ্রহমালা-৪১* (কিসসাপালা : ময়মনসিংহ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১৮/ জুন ২০১১

৭. খাতুন, শাহিদা (সম্পাদিত), *ফোকলোর সংগ্রহমালা-১২৮* (কিস্‌সা ও কিস্‌সাপালা : ময়মনসিংহ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪২৩/ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৮. খান মাহবুব (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *ময়মনসিংহের মেয়েলি গীত,* বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুণ ১৪২৪/ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৯. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদনা), *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- ময়মনসিংহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৪/এপ্রিল ২০১৭

১০. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৩/মার্চ ২০১৭

১১. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১৫/ জুন ২০০৮

১২. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের লোকসংগীত সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২৪ শে অগ্রহায়ণ ১৪২৩/ ৮ ই ডিসেম্বর ২০১৬

১৩. ঐ (সংকলন ও সম্পাদনা), *মহুয়া : তিনটি পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪২৫/ জুন ২০১৮

১৪. ঘোষ, আশিস (সম্পাদিত), *মৈমনসিংহ ও প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

১৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), *তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০

১৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, দে বুক স্টোর, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ, নভেম্বর ২০১২

১৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি চর্চা*, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১

১৮. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, সপ্তম পরিমার্জিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০১২

১৯. চন্দ, বীরেন (সম্পাদিত), *ময়মনসিংহ ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)*, উত্তরধ্বনি, দার্জিলিং, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৪১৯/ নভেম্বর ২০১২

২০. চন্দ, বীরেন (সম্পাদিত), *ময়মনসিংহ ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি (২ খণ্ড)*, উত্তরধ্বনি, দার্জিলিং, সংস্করণ তথ্য অনুল্লেখিত, প্রকাশ সাল অনুল্লেখিত

২১. চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *বাংলার বারোভুঁইয়া ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৬/অক্টোবর ২০০৯

২২. চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও গ্রন্থনা), *ময়মনসিংহের ইতিহাস* (কেদারনাথ মজুমদার, হরচন্দ্র চৌধুরী, শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, মাঘ ১৪১১/জানুয়ারি ২০০৫

২৩. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বাংলার নমঃশূদ্র-১*, কে এন টি এ এ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২১

২৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পাদিত), *গোপীচন্দ্রের গান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯

২৫. মণ্ডল, সন্দীপকুমার (সম্পাদিত), *মৈমনসিংহ-গীতিকা বাঙালির গান বঙ্গের আখ্যান*, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১০ই মে ২০১৯

২৬. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *ময়মনসিংহ-গীতিকা*(সটীক ভূমিকা সহ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

২৭. মৌলিক, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পাদিত), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড)*, প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০/ দ্বিতীয়খণ্ড- ১৯৭১, তৃতীয়খণ্ড- ১৯৭১, চতুর্থখণ্ড- ১৯৭২, পঞ্চমখণ্ড- ১৯৭৪, ষষ্ঠখণ্ড- ১৯৭৪, সপ্তম খণ্ড- ১৯৭৫

(লেখক, প্রকাশক একই হওয়ার কারণে পরবর্তী খণ্ডগুলি ও তার প্রকাশের সাল এভাবে উল্লেখ করা হল)

২৮. রায়, বিশ্বনাথ, রায়, ছন্দা (সম্পাদিত), *বাংলা লোকনাট্য ও রঙ্গমঞ্চ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৩; জুলাই ২০১৬

২৯. লেলিন, নূহ-উল-আলম (সম্পাদনা) , *চলচ্চিত্রের চালচিত্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৭

৩০. সাইদুর, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯১/ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

৩১. সেন, দীনেশচন্দ্র, (সংকলিত ও সম্পাদিত), *পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা (১ম ও ২য় খণ্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৫; জানুয়ারি ২০০৯

৩২. সেন, দীনেশচন্দ্র, (সম্পাদিত) *মৈমনসিংহ-গীতিকা (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৩

৩৩. হোসেন, মুহম্মদ আয়ুব (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা- ১ম খণ্ড*, রাঢ় প্রকাশন, বীরভূম, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯, ২য় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৪২৩)

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

১. Ker, W. P., *On the History of the Ballads 1100-1500.* Folcroft Library Editions, 1974.

২. Sen, Dinesh Chandra (Compiled and Edited by), *Eastern Bengal Ballads Mymensing (Vol. 1: Part 1)*, University of Calcutta, Calcutta, First Print, 1923 (PDF).

৩. Id (Compiled and Edited by), *Eastern Bengal Ballads (Vol. II: Part I)*, University of Calcutta, Calcutta First Print, 1926 (PDF).

৪. Zbavital, Dusann, *Bengali Folk-Ballads from Mymensingh and the Problem of Their Authenticity*, University of Calcutta, India, 1963.

সহায়ক অভিধান

১. *আকাদেমি বানান অভিধান,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮

২. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ, *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান,* কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ ,*বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)* ,নিউ দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, নবম মুদ্রণ, ২০১৬

অপ্রকাশিত রচনা

১. চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, *কমলা সদাগর* (অশোক প্রামাণিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

২. দাস, দেবব্রত, *কন্যা মলুয়া কাঞ্চন* (দেবব্রত দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

৩. চট্টোপাধ্যায়, সানি, *মহুয়া সুন্দরী* (সানি চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. *আজকাল* (দৈনিক), ০১ নভেম্বর ২০০৮

২. *আনন্দবাজার পত্রিকা* (দৈনিক কলকাতা সংস্করণ), শনিবার ১৩ মে ২০১৭
৩. ঐ, ৯৭বর্ষ ১৩৬ সংখ্যা সোমবার ৩১ আষাঢ় ১৪২৫
৪. ঐ, শনিবার ১৫ মে ২০২১
৫. *এই সময় সংবাদ পত্র* (শহর সংস্করণ), ২৪ আষাঢ় ১৪২৫ মঙ্গলবার, ১০ জুলাই ২০১৮
৬. *এবং প্রান্তিক*, ৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮
৭. *কালি ও কলম*, তৃতীয় বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৪২৪; অক্টোবর ২০১৭
৮. *গ্রুপ থিয়েটার*, ৩৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৬ – জানুয়ারি ২০১৭
৯. ঐ, ৪০ বর্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৮
১০. *তবু একলব্য*, ১৩ বর্ষ ৩৩সংখ্যা, জানুয়ারি – জুলাই২০১৮
১১. *তাঁতঘর একুশ শতক*, ষোড়শ ও সপ্তদশ সংখ্যা/নবপর্যায় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংখ্যা, ১লা মার্চ বইমেলা ২০০৮
১২. *দেশ*, ৮৬বর্ষ ১৭সংখ্যা, ০২ জুলাই ২০১৯
১৩. *দৈনিক স্টেটম্যান*, ২৩ আগস্ট ২০০৮
১৪. *নাট্যকথা*, ১৯ বর্ষ, জানুয়ারি ২০১৫
১৫. *নাট্যলোক*, ১০ম বর্ষ ৮ম-৯ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮২
১৬. *পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি*, দ্বাদশ সাধারণ সংখ্যা, আগস্ট ২০০৭
১৭. *বলাকা*, বর্ষ- ২৮সংখ্যা- ৩৭, মার্চ- ২০১৯
১৮. *বহুরূপী*, পঞ্চদশসংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৬৩
১৯. *বহুরূপী*, সংখ্যা- ১২৫, মে ২০১৬
২০. *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ১৪২৬, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৯
২১. *যাত্রা আকাদেমি*, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮
২২. ঐ, পঞ্চম সংখ্যা, জুন ২০১০
২৩. *যাত্রাজগৎ*, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৯
২৪. *যুগান্তর*, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫
২৫. *লোকশ্রুতি*, ১৪বর্ষ ২সংখ্যা, আষাঢ় ১৪২৩/ জুলাই ২০১৬
২৬. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৯
২৭. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০১
২৮. *সংবাদ প্রতিদিন ছুটি*, ১ জুন ২০১৪
২৯. *সংবাদ প্রতিদিন রোববার*, ১৭ জুন ২০১৮

৩০. *The Telegraphy* (Daily), April, 2018

সহায়ক সিডি, ডিভিডি ও অডিও

১. কসবা অর্ঘ্য নাট্য দলের ‘কঙ্ক ও লীলা’ প্রযোজনার অডিও
২. নয়ে নাটুয়া নাট্যদলের দলের ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ নাটকের ডিভিডি
৩. হাবড়া নান্দনিকের ‘সুন্দরী কমলা’-র অডিও

সহায়ক ফাইল

১. নাট্যশোধ সংস্থানে রক্ষিত ‘গৌতম হালদার’ ফাইল। ফাইল নম্বর- CF/498)
২. নাট্যশোধ সংস্থানে রক্ষিত ‘নদীয়া জেলার নাট্যচর্চা’ ফাইল। ফাইল নম্বর- CF/548
৩. নাট্যশোধ সংস্থানে রক্ষিত ‘বিডন স্ট্রিট শুভম’ ফাইল। ফাইল নম্বর- CF/55

সহায়ক ওয়েবসাইট

১. www.anandabazar.com
২. www.youtube.com
৩. www.wikipedia.org